জয় বাংলা

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

জয় বঙ্গবন্ধু

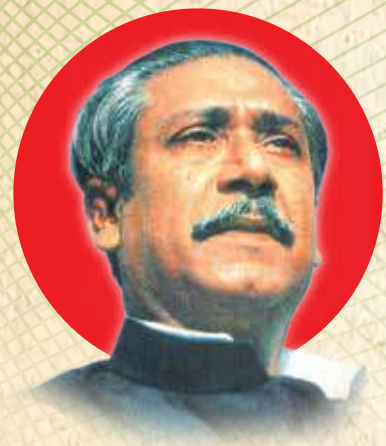

স্মার্ট বাংলাদেশ

উন্নয়ন দৃশ্যমান
বাড়বে এবার কর্মসংস্থান

নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৪

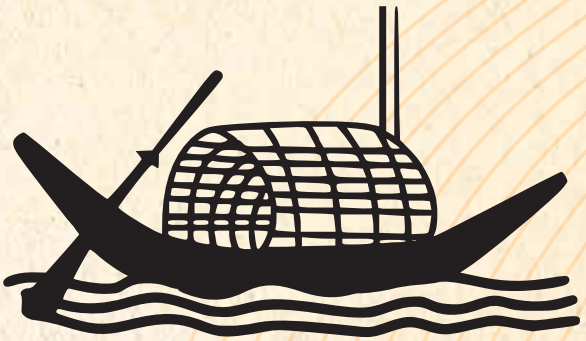

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

স্মার্ট বাংলাদেশ

উন্নয়ন দৃশ্যমান
বাড়বে এবার কর্মসংস্থান

নির্বাচনী

ইশতেহার

২০২৪

জয় বাংলা

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

জয় বঙ্গবন্ধু

স্মার্ট বাংলাদেশ

উন্নয়ন দৃশ্যমান
বাড়বে এবার কর্মসংস্থান

নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৪

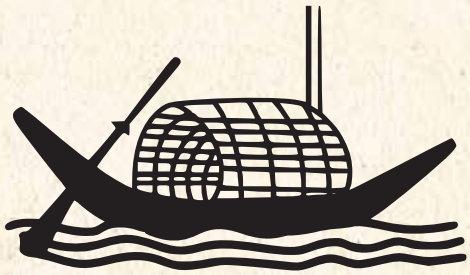

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

স্মার্ট বাংলাদেশ

উন্নয়ন দৃশ্যমান
বাড়বে এবার কর্মসংস্থান

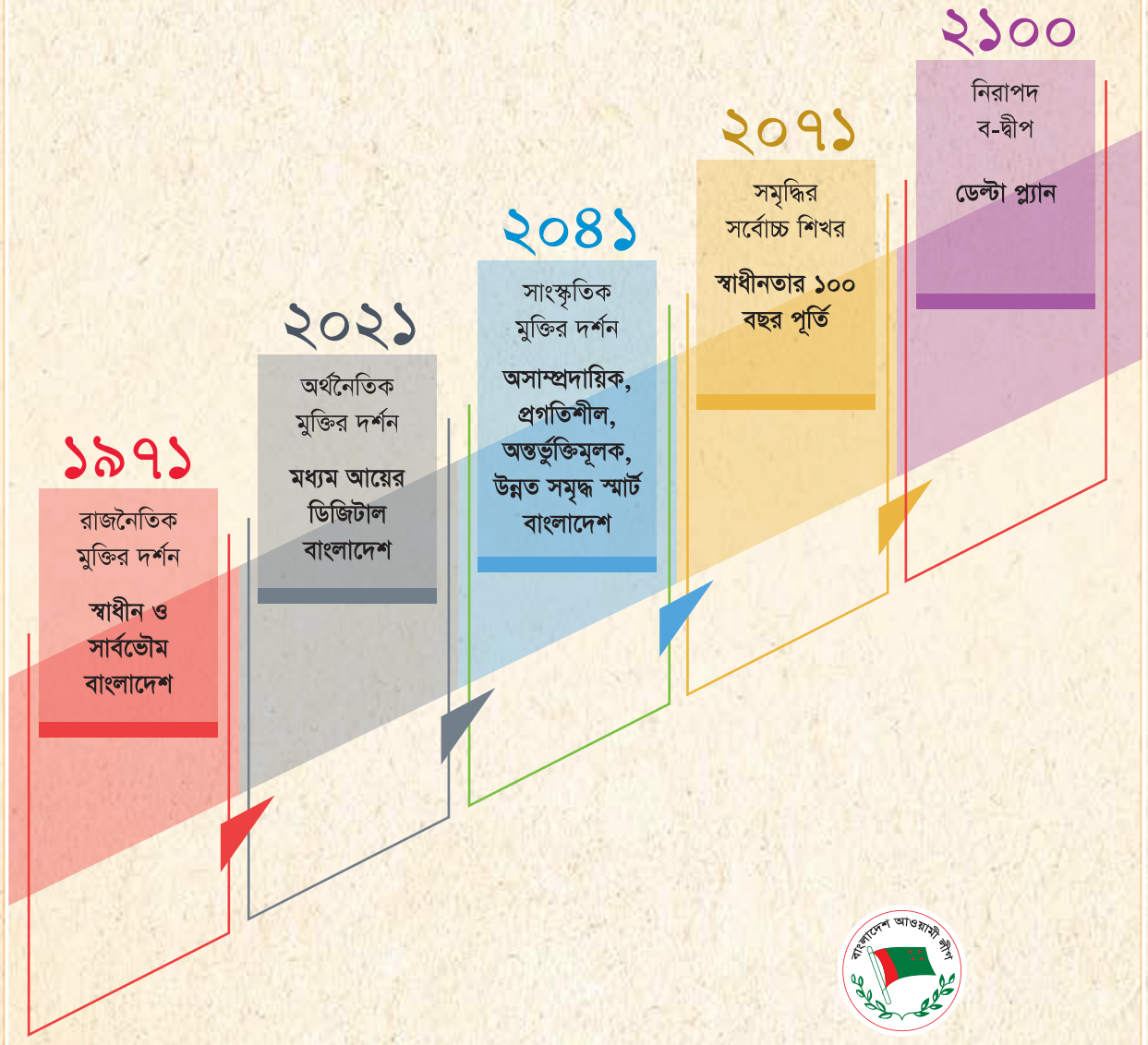

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৭ জানুয়ারি ২০২৪

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার

সূচি

১. **আমাদের বিশেষ অগ্রাধিকার**

২. **পটভূমি**

২.১ **গৌরবোজ্জ্বল পাঁচ বছর** (জুন ১৯৯৬ থেকে জুলাই ২০০১) : স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুবর্ণ সময় ১৩

২.২ **বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার** (অক্টোবর ২০০১ থেকে নভেম্বর ২০০৬) : লুণ্ঠন, দুঃশাসন ও দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ ১৪

২.৩ **তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল :** গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও উত্তরণ ১৫

২.৪ **আওয়ামী লীগ শাসনামল** (জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩) : উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে বিশ্বের বিস্ময় বাংলাদেশ ১৬

৩. **সরকার পরিচালনায় তিন মেয়াদে (২০০৯-২০২৩) উন্নয়ন ও অগ্রগতি এবং আমাদের অঙ্গীকার (২০২৪-২০২৮)**

৩.১ **ডিজিটাল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে উত্তরণ** ১৯

৩.২ **সুশাসন** ২০

ক. গণতন্ত্র, নির্বাচন ও কার্যকর সংসদ ২০

খ. আইনের শাসন ও মানবাধিকার সুরক্ষা ২১

গ. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ ২৩

ঘ. জনকল্যাণমুখী, জবাবদিহিমূলক ও স্মার্ট প্রশাসন ২৫

ঙ. জনবান্ধব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ২৫

চ. দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ ২৭

ছ. সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা ২৮

জ. স্থানীয় সরকার ২৮

ঝ. ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা ৩০

৩.৩ **অর্থনীতি** ৩১

ক. সামষ্টিক অর্থনীতি : উচ্চ আয়, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ৩১

খ. দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈষম্য হ্রাস ৩৮

গ. ‘আমার গ্রাম—আমার শহর’ : প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ ৪১

ঘ. তরুণ যুবসমাজ : তারুণ্যের শক্তি—বাংলাদেশের সমৃদ্ধি ৪২
ঙ. কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি ৪৪
চ. শিল্প উন্নয়ন ৪৯
ছ. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ৫২
জ. যোগাযোগ ৫৫
ঝ. অবকাঠামো উন্নয়নে বৃহৎ প্রকল্প (মেগা প্রজেক্ট) ৫৮
ঞ. সুনীল অর্থনীতি ৫৯
ট. এমডিজি অর্জন এবং এসডিজি (টেকসই উন্নয়ন) বাস্তবায়ন কৌশল (২০১৬-২০৩০) ৬১
ঠ. ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ ৬২

৩.৪ সামাজিক নিরাপত্তা ও সেবা ৬৩
ক. সর্বজনীন পেনশন ৬৩
খ. শিক্ষা ৬৩
গ. স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার কল্যাণ ৬৫
ঘ. সংস্কৃতি ৬৮
ঙ. ক্রীড়া ৬৯
চ. শ্রমিক কল্যাণ ও শ্রমনীতি ৭১
ছ. নারীর ক্ষমতায়ন ৭৩
জ. শিশু কল্যাণ ৭৫
ঝ. মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ ৭৭
ঞ. প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ কল্যাণ ৭৯
ট. ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু ৮২
ঠ. অনগ্রসর জনগোষ্ঠী ৮৩
ড. জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সুরক্ষা ৮৫
ঢ. এনজিও ও সরকার ৮৬

৩.৫ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ৮৭
ক. পররাষ্ট্র ৮৭
খ. প্রতিরক্ষা : নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষা ৮৮

৪. বিশ্বনন্দিত রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই সম্ভব হবে অঙ্গীকার বাস্তবায়ন ৯৩

দেশবাসীর প্রতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার আহ্বান ৯৫

"সাত কোটি মানুষকে দাবায়া রাখতে পারবা না।"

– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"২১শে আগস্টের হামলা যারা করেছে, তারা জনগণকে ভয় পায়। জনগণের দল আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। খুনিরা জানে না, ব্যক্তিকে হত্যা করা যায়। আদর্শ ও নীতিকে হত্যা করা যায় না।"

– জননেত্রী শেখ হাসিনা

১

আমাদের বিশেষ অগ্রাধিকার

- দ্রব্যমূল্য সকলের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া
- কর্মোপযোগী শিক্ষা ও যুবকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা
- আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা
- লাভজনক কৃষির লক্ষ্যে সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থা, যান্ত্রিকীকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ বৃদ্ধি
- দৃশ্যমান অবকাঠামোর সুবিধা নিয়ে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে শিল্পের প্রসার ঘটানো
- ব্যাংকসহ আর্থিক খাতে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা
- নিম্ন আয়ের মানুষদের স্বাস্থ্যসেবা সুলভ করা
- সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় সকলকে যুক্ত করা
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যকারিতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা
- সাম্প্রদায়িকতা এবং সকল ধরনের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ রোধ করা
- সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুরক্ষা ও চর্চার প্রসার ঘটানো

"আন্দোলন মুখ দিয়ে বললেই করা যায় না। আন্দোলনের জন্য জনমত সৃষ্টি করতে হয়। আন্দোলনের জন্য আদর্শ থাকতে হয়। আন্দোলনের জন্য নিঃস্বার্থ কর্মী হতে হয়। ত্যাগী মানুষ থাকা দরকার। আর সর্বোপরি জনগণের সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ সমর্থন থাকা দরকার।"

– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

২

পটভূমি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ মুক্তিকামী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে দীর্ঘ সংগ্রাম ও যুদ্ধ বিজয়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ স্বপ্নের সোনালি অধ্যায় অতিক্রম করছে। ত্রিশ লক্ষ শহিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশ আজ সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রার মহাসড়কে রয়েছে। বিশ্বপরিমণ্ডলে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে উন্নয়নের রোল মডেল। উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে সঠিক পথেই রয়েছে বাংলাদেশ। জাতীয় আয়ের মানদণ্ডে বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের ৩৩তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে স্বীকৃত। কোভিড দুর্যোগ, রাশিয়া-ইউক্রেন ও ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বিশ্বরাজনীতির টানাপোড়েন এবং অর্থনীতির শ্লথ গতি, মন্দার অভিঘাতের মধ্যে বিশ্বের সব দেশের অর্থনীতি যখন সমস্যা-সংকটে আবর্তিত, সেই সময়েও দেশে উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রয়েছে।

আওয়ামী লীগের সভাপতি দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার সফলতার সঙ্গে উন্নয়ন-অগ্রগতি অব্যাহত রেখে অর্থনৈতিক অভিঘাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বেই বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে গর্বিত জাতি হিসেবে যোগ্য সম্মান ও মর্যাদা পাচ্ছে। পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের পর অনেক বাধা-বিপত্তি, চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আজ নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের ধারায় বিশ্বসমাজে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এই সময়ে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ ২০২০' ও 'মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২০২১' উদ্‌যাপন ছিল স্বাধীন দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় ঘটনা।

বাংলাদেশের উন্নয়ন আজ দৃশ্যমান, বিশ্বসমাজে উচ্চ প্রশংসিত। ঘরে ঘরে আজ বিদ্যুতের আলো। আশ্রয়ণ প্রকল্পে অতি দরিদ্র গৃহহারা মানুষ আজ মাথা গোঁজার ঠাঁই পাচ্ছে। কৃষি ও খাদ্যনিরাপত্তায় অর্জিত হয়েছে বিস্ময়কর সাফল্য। ছেলে-মেয়ে সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। ইন্টারনেট ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সকল সুবিধা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছেছে। মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নসাধ সংবিধানে স্বীকৃত জনগণের মৌলিক অধিকার অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-চিকিৎসা-বাসস্থান প্রাপ্তিতে অতীতের গ্লানি মোচন করতে সক্ষম হয়েছে।

ইতোমধ্যে 'আমার গ্রাম—আমার শহর' এবং 'তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি', যা ছিল বিগত নির্বাচনে দুটো বিশেষ অঙ্গীকার, তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। তারুণ্যের শক্তি কার্যকর হতে থাকার কারণেই 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' থেকে 'স্মার্ট বাংলাদেশে' যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। সংস্কৃতি ও ক্রীড়াক্ষেত্রে যুবসমাজের পদচারণা জাতীয় জাগরণে ভূমিকা রাখছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিদ্যুৎসহ সকল সেবা-সুবিধা হাতের নাগালে যাওয়ার ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামের মানুষ আজ শহরের সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে সক্ষম হচ্ছে।

অতি দরিদ্র ও দরিদ্র জনগণের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন ও ক্রমসম্প্রসারণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, শ্রমিক-কৃষকসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

সুরক্ষায় বাংলাদেশ আজ সদা জাগ্রত। জিরো টলারেন্স নীতি কার্যকর থাকায় উগ্র সশস্ত্র জঙ্গিবাদী কার্যক্রম বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। স্বচ্ছতা-জবাবদিহি বজায় রেখে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চেতনাকে সরকার ঊর্ধ্বে তুলে ধরছে। মানবাধিকার ও আইনের শাসন আজ সুরক্ষিত। দক্ষ, সেবামুখী ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা দৃশ্যমান। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক নাগরিকের আইনের আশ্রয় লাভের সুযোগ আজ অবারিত।

বর্তমান অস্থিতিশীল ও জটিল বিশ্বব্যবস্থায় সকল দেশ বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে যখন কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে, তখন বাংলাদেশ সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদে নির্দেশিত 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়' নীতিতে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এক শক্তিশালী ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে, যা জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সমৃদ্ধি ও বৈশ্বিক শান্তির প্রতি তাঁর অবিচল অঙ্গীকারের সাক্ষ্য বয়ে চলেছে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে অশুভ ও জাতিবিরোধী শক্তির প্রতিভূ বিএনপি-জামায়াত অযৌক্তিক ও জনসম্পৃক্ততাহীন আন্দোলনের নামে আগুন-সন্ত্রাস, নিরীহ মানুষ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের হত্যা এবং জনগণের সম্পদ বিনষ্ট করার অশুভ খেলায় মেতে উঠেছে। এই অশুভ শক্তি শুধু দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধানকেই অস্বীকার করছে না, বরং জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়ন, আইনের শাসন ও মানবাধিকার সুরক্ষার যে জনবান্ধব ধারার সৃষ্টি হয়েছে, সেসব বানচাল করে অতীতের ধারাবাহিকতায় একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে চাইছে। বাংলাদেশকে তারা আবারও উগ্র জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাস-লুটপাটের সেই দুঃসহ দিনগুলোতে ফিরিয়ে নিতে চায়। বিএনপি-জামায়াত জোট ২০০১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সহায়তায় ভোট ডাকাতির নির্বাচনের ভেতর দিয়ে যে দুষ্কর্ম করেছিল, ঠিক সেই কাজটাই এবারও করতে তারা ষড়যন্ত্র-চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। বিএনপি-জামায়াতের দুঃশাসন ও অপশাসনের দিনগুলোর বেদনাদায়ক ও দুঃসহ ধারায় আর ফিরে যেতে চায় না বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এখন অতীতের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে তরুণ-যুবসমাজের মেধা, সৃজনশীলতা ও অমিত শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী বাংলাদেশ গড়ার ধারায় অগ্রসর হতে চায়।

২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত টানা তিন মেয়াদে ১৫ বছর জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগ সরকার বিদ্যমান বাস্তবতায় জনকল্যাণমুখী ও সুসমন্বিত কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে একটি সমতা ও ন্যায়ভিত্তিক গণতান্ত্রিক দেশ বিনির্মাণের পথে জাতিকে অগ্রসরমাণ রেখেছে। ইতোমধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের একটি টেকসই ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এই ভিত্তির ওপর ভর করে ২০৪১ সালের মধ্যে 'উন্নত-সমৃদ্ধ-স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে তোলাই আওয়ামী লীগের বর্তমান লক্ষ্য। সম্ভাবনাময় বিশাল তরুণসমাজই হবে এর মূল কারিগর। দেশে শিল্পায়ন ও দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের জন্য যে কাঙ্ক্ষিত অনুকূল ও সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তার সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা হবে। ২০২৪-২০২৮ সময়কালে এসব উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা গেলে তা বাংলাদেশের উন্নয়নের মোড় ঘুরিয়ে দেবে। দেশের উন্নয়ন ইতিহাসে নতুন ধারা সৃষ্টি হবে। উৎপাদন শক্তির বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে।

জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ লড়াই-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে বলেই জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার সুনিশ্চিত হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলেই জনগণ কিছু পায়। জাতির উন্নতি-সমৃদ্ধির ঈপ্সিত অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য বর্তমান সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আজ জাতির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন।

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার শুধু অঙ্গীকারের ফানুস নয়; বরং তা দূরদর্শী, বাস্তবমুখী ও অর্জনযোগ্য। বিগত নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ যেসব প্রতিশ্রুতি জাতির সামনে দিয়েছিল, এর বেশির ভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে; কিছু

প্রতিশ্রুতি মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি হওয়ায় বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অভিজ্ঞতা থেকে জনগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, এবারের নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ যেসব প্রতিশ্রুতি, লক্ষ্য ও কর্মসূচি দেবে, আগামী দিনে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে।

আওয়ামী লীগ সভাপতি দেশরত্ন শেখ হাসিনার দিক-নির্দেশনায় বিগত তিন মেয়াদের নির্বাচনী ইশতেহারের ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধ ও জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে নেতৃত্বদানকারী দেশের সর্ববৃহৎ জননন্দিত ঐতিহ্যবাহী দল আওয়ামী লীগ দেশবাসীর উদ্দেশে 'স্মার্ট বাংলাদেশ ইশতেহার-২০২৪' উপস্থাপন করছে।

২.১. গৌরবোজ্জ্বল পাঁচ বছর (জুন ১৯৯৬-২০০১) : স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুবর্ণ সময়

পঁচাত্তর-পরবর্তী সকল গ্লানি, কলঙ্ক, ব্যর্থতা পেছনে ফেলে সুদীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬-২০০১ আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামল জাতি, রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় দেশ পরিচালিত হয়। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের ভেতর দিয়ে জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়। ১৯৯৭ সালে ভারতের সঙ্গে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গা পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের ফলে সেখানে দুই যুগের ভ্রাতৃঘাতী হানাহানি-রক্তপাত বন্ধ হয়। আঠারো শ অস্ত্রধারী অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কুখ্যাত 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' বাতিল করে ইতিহাসের কলঙ্ক মোচন করা হয়। ফলে জাতির পিতার হত্যার বিচারকার্য সম্পন্ন করার বাধা দূর হয়।

প্রথমবারের মতো দেশ খাদ্যে আত্মনির্ভরশীল হয়। মুদ্রাস্ফীতির হার নেমে আসে ১.৫ শতাংশে, যা ইতিহাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে। পাঁচ বছরে প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় গড়ে প্রায় ৬ শতাংশ হারে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়েনি। জনগণের মাথাপিছু আয় ২৮০ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ৩৮৬ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। মানব দারিদ্র্যসূচক ১৯৯৫-৯৬ সালের ৪১.৬ শতাংশ থেকে ২০০১ সালে ৩৪ শতাংশে নেমে আসে। একই সময়ে মানুষের গড় আয়ুষ্কাল ৫৮.৭ বছর থেকে ৬২ বছরে উন্নীত হয়। সাক্ষরতার হার বিএনপি আমলের ৪৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬৫.৫ শতাংশে উন্নীত হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৬০০ থেকে ৪৩০০ মেগাওয়াটে বৃদ্ধি করা হয়। স্থাপিত হয় নতুন নতুন শিল্প-কারখানা ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা। বেড়ে যায় বৈদেশিক বিনিয়োগ।

দারিদ্র্য বিমোচনে দেওয়া হয় সর্বোচ্চ গুরুত্ব। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো 'বয়স্ক ভাতা', 'বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত মহিলা ভাতা', 'অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ভাতা', 'আশ্রয়ণ প্রকল্প', 'গৃহায়ণ', 'আদর্শ গ্রাম', স্বাধীনতার পরপরই বঙ্গবন্ধুর সময় চালু হওয়া 'গুচ্ছগ্রাম' ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সত্যিকারের অসহায় হতদরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ায় সরকার। এ ছাড়া 'একটি বাড়ি একটি খামার', 'কর্মসংস্থান ব্যাংক'সহ আত্মকর্মসংস্থানমূলক বহুমুখী সৃজনশীল প্রকল্প ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পঁচাত্তর-পরবর্তী শাসকদের লুটপাট, দুর্নীতি, সন্ত্রাস এবং অ্যাডহক-ভিত্তিতে দেশ পরিচালনার ধারা পরিহার করে অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয় দীর্ঘমেয়াদি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা।

বাংলাদেশের ইতিহাসে সেবারই প্রথম একটি নির্বাচিত সরকার তার পাঁচ বছরের পূর্ণ মেয়াদ শেষে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার স্বার্থে সংবিধান অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবে ২০০১ সালের ১৫ই জুলাই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

পঁচাত্তর-পরবর্তী হুকুমের নির্বাচন এবং সেনা ও স্বৈরশাসক নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের বিপরীতে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ অবাধ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক ধারায় দেশকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অমোচনীয় কালিতে লিপিবদ্ধ থাকবে।

২.২ বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার (অক্টোবর ২০০১-নভেম্বর ২০০৬) : লুণ্ঠন, দুঃশাসন ও দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ

বিচারপতি লতিফুর রহমানের চক্রান্তমূলক ও পক্ষপাতদুষ্ট তথাকথিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ভোট ডাকাতির নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি-জামায়াত জোটের ক্ষমতায় আসাটা ছিল জাতির জন্য চরমতম কলঙ্ক ও দুর্ভাগ্যের। একাত্তরের পরাজিত শক্তি পঁচাত্তরের পর ক্ষমতা দখল করে সামরিক শাসনের মধ্যে যে প্রক্রিয়া শুরু করেছিল, নির্বাচনের পর থেকে সেই একই কায়দায় সুপরিকল্পিতভাবে নির্বিচারে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী, নিরীহ ভোটার, বিশেষভাবে সংখ্যালঘু ও মহিলা ভোটারদের ওপর পাশবিক অত্যাচার, লুটপাট, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ তথা এথনিক ক্লিনজিং চালানো হয়। উন্নয়নের সকল সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটে। দেশ পরিণত হয় মৃত্যু উপত্যকায়।

আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বশূন্য এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমূলে উৎপাটিত করার সুপরিকল্পিত নীলনকশার অংশ হিসেবেই প্রতিহিংসাপরায়ণ বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই একের পর এক সশস্ত্র আক্রমণ-অভিযান পরিচালনা করে। ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গ্রেনেড হামলা ছিল সেই নৃশংস বর্বরতার চরমতম বহিঃপ্রকাশ। এই হামলায় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেত্রী আইভি রহমানসহ ২৪ জন নেতা-কর্মী নিহত ও ৫০০ জন আহত হন। একই উদ্দেশ্যে সাবেক অর্থমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য শাহ এএমএস কিবরিয়া, শ্রমিকনেতা ও সংসদ সদস্য আহসানউল্লাহ মাস্টার, অ্যাডভোকেট মঞ্জুরুল ইমাম, মমতাজ উদ্দিনসহ আওয়ামী লীগের ২১ হাজার নেতা-কর্মী এবং মানিক সাহা, গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী, জ্ঞানজ্যোতি মহাথেরো প্রমুখ বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সংখ্যালঘু পুরোহিতকে বিএনপি-জামায়াত জোট ও তাদের ক্যাডার সন্ত্রাসীরা হত্যা করে। সরকারি মদদে উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গিগোষ্ঠীর উত্থান, গ্রেনেড হামলা, বোমাবাজিসহ একের পর এক হত্যাকাণ্ডের ফলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের নতুন টার্গেটে পরিণত হয়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ চিহ্নিত হয় অকার্যকর রাষ্ট্র, সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে।

বিএনপি-জামায়াত জোট শাসনামলের পাঁচ বছরে খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম জনগণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। বিগত আওয়ামী লীগ আমলের তুলনায় দ্রব্যমূল্য ১০০-২০০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রাস্ফীতির হার ১০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। পক্ষান্তরে প্রবৃদ্ধির হার ৫.৯২ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়ায় ৫.৪ শতাংশে। বিএনপি-জামায়াত জোটের পাঁচ বছর ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছরসহ মোট সাত বছরের শাসনামলে নতুন করে দরিদ্র মানুষের তালিকায় যুক্ত হয় ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ হ্রাস পায়।

বিএনপি-জামায়াত জোট দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দিয়ে ক্ষমতায় এলেও দুর্নীতি-লুণ্ঠন ও দুর্বৃত্তায়নই সরকারের নীতি হয়ে দাঁড়ায়। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার প্রশ্রয়ে তার পুত্র তারেক রহমানের নেতৃত্বে 'হাওয়া ভবন'কে রাষ্ট্রক্ষমতার সমান্তরাল কেন্দ্রে পরিণত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান কালোটাকার অধিকারী হয়ে পড়েন এবং তাদের সন্তানরা ও সরকারের মন্ত্রী-নেতারা বিদেশে অর্থ পাচারের সঙ্গে যুক্ত হন। বিএনপি-জামায়াত জোটের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, নেতা-কর্মী এবং দলীয় প্রশাসনের অকল্পনীয় দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, লুটপাট, চাঁদাবাজি প্রভৃতির ফলে টিআইবি পরপর পাঁচবার বাংলাদেশকে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত করে। সর্বক্ষেত্রে সরকারের দুর্নীতি,

অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনা এবং দুঃশাসনের ফলে উন্নয়ন মুখ থুবড়ে পড়ে। শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে সৃষ্টি হয় চরম সংকট। বিদ্যুতের দাবি জানাতে গেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার কানসাটে ২০ জন কৃষককে গুলি করে হত্যা করা হয়।

বিএনপি-জামায়াত জোট ব্রুট মেজরিটির জোরে সংসদকে অকার্যকর এবং সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে। ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী ও পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে আজ্ঞাবহ দলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। সংবিধান ও সুপ্রিম কোর্টের রায় উপেক্ষা করে ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটারসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে ৩ শতাধিক দলীয় ক্যাডারকে নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। জনগণের ভোটাধিকার হরণ ও কারচুপিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যার ফলে পুরো নির্বাচন-ব্যবস্থা বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। ভূলুণ্ঠিত হয় জনগণের ভোটের অধিকার।

২.৩ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল : গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও উত্তরণ

বিগত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা বাধাবিঘ্নহীন করতে সংবিধান অনুযায়ী নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে জননেত্রী শেখ হাসিনা যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, ঠিক এর বিপরীতে গণতন্ত্রের ভিত্তিমূলকে ধ্বংস করার কলঙ্কজনক কাজটিই করে বিএনপি-জামায়াত জোট নেত্রী খালেদা জিয়া। পাতানো নির্বাচন করার উদ্দেশ্যে নানা নাটকের পর তাঁবেদার রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিএনপি-জামায়াত জোটের নীলনকশা বাস্তবায়িত করতে গিয়ে অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচনের সকল সম্ভাবনা নস্যাৎ করে। বিএনপি ও জামায়াত জোট সরকারের দুঃশাসন, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে জনরোষ সৃষ্টি হয়। তদুপরি ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার তালিকা, আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিনের নিয়োগ জনগণ মেনে নিতে পারেনি। ২০০৭ সালের ২২শে জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য নীলনকশার নির্বাচন বর্জন ও প্রতিহত করতে বিক্ষুব্ধ জনগণ রাস্তায় নেমে আসে। ১১ই জানুয়ারির পটপরিবর্তন সংঘটিত হয়। দেশে ড. ফখরুদ্দীনের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতাসীন হলে জরুরি অবস্থা জারি করা হয় এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দীর্ঘদিন নিষিদ্ধ থাকে।

১১ই জানুয়ারি ২০০৭-এর ক্ষমতার পটপরিবর্তন যেমন নির্বাচন প্রশ্নে বিদ্যমান সংকট মোচনের পথ উন্মুক্ত করে, তেমনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ছত্রচ্ছায়ায় মহলবিশেষের বাড়াবাড়ি, জবরদস্তি, বিরাজনীতিকরণের প্রচেষ্টা এবং 'মাইনাস টু' ফর্মুলা বাস্তবায়নের ষড়যন্ত্র দেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎকেই অনিশ্চিত করে তোলে। ক্ষমতার ছত্রচ্ছায়ায় ড. ইউনূসকে সামনে রেখে 'কিংস পার্টি' গড়ে তোলা এবং খালেদা জিয়া, তারেক রহমান ও বিএনপি-জামায়াতের অপকর্ম-দুষ্কর্ম আড়াল করার হীন উদ্দেশ্য নিয়ে আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার জন্য প্রথমে টার্গেট করা হয় জননেত্রী শেখ হাসিনাকে। এই সরকার বঙ্গবন্ধুকন্যার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, কারাবন্দি করে জীবন বিপন্ন করার অপচেষ্টা চালায়। গড়ে ওঠে ব্যাপক ও তীব্র আন্দোলন। শেষ পর্যন্ত জননেত্রী শেখ হাসিনার অনমনীয় আপসহীন সাহসী ভূমিকার ফলে কার্যত মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে রাজনীতি থেকে, তার প্রিয় স্বদেশবাসীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। ফলে দেশে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথ সুগম হয়।

২.৪ আওয়ামী লীগ শাসনামল (জানুয়ারি ২০০৯-ডিসেম্বর ২০২৩) : উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে বিশ্বের বিস্ময় বাংলাদেশ

২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয় বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের চরম দুর্বৃত্তায়ন ও লুটপাট এবং সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চরম অব্যবস্থাপনা থেকে সৃষ্ট গভীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে বাঙালি জাতির জন্য সম্ভাবনার এক স্বর্ণদুয়ার উন্মোচন করে। জননন্দিত নির্বাচনী ইশতেহার 'দিন বদলের সনদ'-এর বাস্তবায়ন শুরু হলে দেশ আবারও ১৯৯৬-২০০১ শাসনামলের মতো আলোকোজ্জ্বল পথে যাত্রা শুরু করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের হত্যাকাণ্ডে অসমাপ্ত বিচারকাজ সম্পন্ন এবং আদালতের রায় কার্যকর করা, মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকাজ শুরু করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠন ও বিচারকাজ শুরু করা, জাতীয় চারনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন, মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের স্বীকৃতি, সাংবিধানিকভাবে অগণতান্ত্রিক পন্থায় সরকার পরিবর্তনের পথ রুদ্ধ করার মতো উল্লেখযোগ্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত এ সময়কালে বাস্তবায়ন করা হয়।

সংবিধান ও গণতন্ত্রকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা, উন্নয়নকে বাধাবিঘ্নহীন করা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ পরিচালনার পথ এবারেও মসৃণ ছিল না। বিএনপি-জামায়াত জোট সংসদ বর্জন করে হরতাল, অবরোধ ও আগুন-সন্ত্রাসের মাধ্যমে অশান্তি অরাজকতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির সর্বাত্মক অপপ্রয়াস চালায়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচালের জন্য পরাজিত দেশি ও আন্তর্জাতিক শক্তি, বিশেষভাবে পাকিস্তান মরিয়া হয়ে ওঠে।

২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচন সামনে রেখে ২০১৩ সাল থেকে বিএনপি, জামায়াতসহ স্বাধীনতাবিরোধী উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি অগ্নি-সন্ত্রাস শুরু করলে তাদের জাতিবিরোধী সন্ত্রাসী চরিত্র দেশবাসীর সম্মুখে উন্মোচিত হয়ে পড়ে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যসহ সাধারণ নাগরিকদের হত্যা ও '৭১-এর মতোই যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষায় জামায়াত-শিবিরের ঘাতক বাহিনী বিএনপিকে নিয়ে দেশবাসীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

জনগণের পবিত্র আমানত ভোটের অধিকার সুরক্ষার জন্য নির্বাচনকালীন সরকারের প্রশ্নে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়াকে টেলিফোনে সংলাপের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু সংলাপের আহ্বান অসৌজন্যমূলকভাবে প্রত্যাখ্যান করে অন্তর্বর্তীকালীন সর্বদলীয় সরকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে লাগাতার হরতাল, অবরোধ ও আগুন-সন্ত্রাসের মাধ্যমে নির্বাচন বানচালের ঘোষণা দেয়।

বিএনপি-জামায়াতের অভাবনীয় ও নৃশংস তাণ্ডব মোকাবিলা করে নির্বাচন সম্পন্ন হয়। নতুন উদ্যমে নতুন সরকার উন্নয়ন কর্মসূচি এবং জনগণের মৌলিক অধিকার সুরক্ষা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আত্মনিয়োগ করে। উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার সাফল্যের প্রেক্ষাপটে অনুকূল পরিস্থিতিতে সরকারের দ্বিতীয় বছর শুরু হলে জাতিবিরোধী সাম্প্রদায়িক পরাজিত শক্তি হিংসা ও ধ্বংসের অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক ভ্রান্ত পথ আবারও গ্রহণ করে। জানুয়ারি ২০১৫ থেকে একটানা ৯০ দিন বিএনপি-জামায়াত জোট হরতাল-অবরোধ করে। এ সময় পৈশাচিকতা এবং বর্বরতার মাত্রা মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও নাশকতাকেও হার মানায়।

এরই ধারাবাহিকতায় নিরীহ ও মুক্তমনা মানুষ, সংখ্যালঘু ও বিদেশি, মসজিদের ইমাম, হিন্দু পুরোহিত, খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের হত্যা এবং বৌদ্ধ-হিন্দু মন্দির আক্রমণ করে। সবশেষে ঢাকায় গুলশানের হোলি আর্টিজান বেকারি নামক রেস্তোরাঁয় আক্রমণ করে ১৭ জন বিদেশিসহ ২২ জন নিরীহ মানুষকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করা হয়।

এই পরিস্থিতিতে জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই জঙ্গি দমনে সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতি মানুষের ব্যাপক সমর্থন অর্জন করে। অসহায় শরণার্থীদের স্থান দিতে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলো যেখানে অমানবতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছে, তখন বাংলাদেশ মিয়ানমার থেকে অবৈধ ও অন্যায়ভাবে বিতাড়িত রোহিঙ্গা অসহায় শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে মানবতার পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে।

এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে বিএনপি ২০১৮ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ক্ষমতায় থাকতে অপকর্ম-দুষ্কর্ম এবং ক্ষমতার বাইরে গিয়ে আগুন-সন্ত্রাস করে বিএনপি তখন ছিল ছত্রখান ও জনবিচ্ছিন্ন। সর্বোপরি দুর্নীতি-সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদের মদদদাতা, দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে শাস্তিপ্রাপ্ত, মুচলেকা দিয়ে বিদেশে অবস্থানরত, জনগণ প্রত্যাখ্যাত তারেক রহমানকে নেতা হিসেবে সামনে রেখে বিএনপি নির্বাচনে নামে। শুরুতেই দলীয় মনোনয়ন নিয়ে জোচ্চুরির অভিযোগে দলীয় প্রার্থীদের দ্বারা অভিযুক্ত হন 'হাওয়া ভবন' ও 'খোয়াব ভবন' খ্যাত তারেক রহমান। আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে বিএনপি নির্বাচনী জোট গঠনের ক্ষেত্রে দুই নৌকায় পা রাখার কৌশল নেয়। একদিকে জামায়াতের সঙ্গে জোটবদ্ধ থাকে, অপরদিকে ড. কামালের নেতৃত্বে ঐক্যফ্রন্টের সঙ্গে নির্বাচনী জোট করে। এসবের ফলে নির্বাচন ঘিরে বিএনপির সার্বিক কর্মকাণ্ড হতাশাজনক পর্যায়ে পৌঁছায় এবং ফলাফলে ভরাডুবি হয়।

স্বাভাবিকভাবেই বিএনপি আর মাথা তুলে দাঁড়ানোর মতো অবস্থায় থাকে না। সংবিধান ও গণতন্ত্রের প্রতি কোনো শ্রদ্ধাবোধ না থাকা এবং ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের মাধ্যমে ফায়দা লোটার উদ্দেশ্য নিয়ে বিএনপির সংসদ সদস্যরা কোনো কারণ ছাড়া একপর্যায়ে পদত্যাগ করে। আত্মঘাতী এই কৌশলে বিএনপি পড়ে আরও হতাশার চোরাগলিতে। যার ফলে বিএনপি বর্তমানে নির্বাচনকে সামনে রেখে জামায়াতকে সঙ্গে নিয়ে আবারও ২০১৪ সালের নির্বাচন-পূর্ব সময়ের মতো হত্যা-খুন, নাশকতা ও আগুন-সন্ত্রাসে নেমেছে। জনগণ পূর্বের মতোই এই পথ প্রত্যাখ্যান করেছে।

বিগত ১৫ বছরে তিন মেয়াদে জাতীয় সংসদ ৬২৮টি আইন পাস করেছে। দেশ ও জনগণের কল্যাণে গৃহীত কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হলো : সংবিধানের পঞ্চম সংশোধন, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের স্বাধীনতা, ভোটার তালিকা সংস্কার, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ, তথ্য অধিকার, ভোক্তা অধিকার, মানবাধিকার কমিশন, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ আদালত, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ, শিশু আইন, প্রতিবন্ধী অধিকার ও সুরক্ষা, নারী ও শিশু নির্যাতনদমন, সর্বজনীন পেনশন, সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, বাল্যবিবাহ নিরোধ, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।

বিগত তিন মেয়াদে ১৫ বছর জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার মধ্যেও একদিকে যেমন জনগণের কাছে প্রদত্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও কূটনৈতিক প্রতিশ্রুতি রক্ষার উচ্চতর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, অন্যদিকে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদের উত্থান মোকাবিলা এবং আইনের শাসন ও মানবাধিকার সুরক্ষায় সরকারের দৃঢ়তা ও সাফল্য জনমনে এক নতুন আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করে। সম্ভাবনার এই স্বর্ণদুয়ার উন্মোচনে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা হয়ে ওঠেন অতীতের ঐতিহ্য সুরক্ষা, বর্তমানের সফল পথচলা এবং ভবিষ্যতের সুখী-সমৃদ্ধ-স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার অকুতোভয় ও বিশ্বস্ত কাণ্ডারি।

"মাটি আর মানুষের সাথে রাজনীতিকে একাত্ম করতে হবে। সমাজের গভীর থেকে গভীরতর স্তরে পৌঁছুতে হবে। জনগণের বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে সততা ও যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে।"

– জননেত্রী শেখ হাসিনা

৩

সরকার পরিচালনায় তিন মেয়াদে (২০০৯-২০২৩) উন্নয়ন ও অগ্রগতি এবং আমাদের অঙ্গীকার (২০২৪-২০২৮)

৩.১ ডিজিটাল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে উত্তরণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে বিজ্ঞানমনস্কতা এবং বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আওয়ামী লীগের ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার 'দিন বদলের সনদ'-এ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। রূপকল্প ২০২১-এর মূল উপজীব্য ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জনে প্রণয়ন করা হয়েছিল প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১। এই পরিকল্পনা ভিত্তি স্থাপন করেছে স্মার্ট বাংলাদেশ অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার। ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০২৫, ২০৩১ ও ২০৪১-এর সময়রেখার মধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তাতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যুক্ত হয়ে তৈরি করবে স্মার্ট বাংলাদেশ। আওয়ামী লীগ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ দেশ ও সমাজের উন্নতি নিশ্চিত করবে, গড়ে তুলবে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই ডিসেম্বর ২০২২ ঘোষণা করেন সরকারের 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়। স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক, জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিগত এবং উদ্ভাবনী। স্মার্ট বাংলাদেশের রয়েছে চারটি স্তম্ভ—স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার ও স্মার্ট সমাজ।

স্মার্ট নাগরিক

শতভাগ শিক্ষিত নাগরিকেরা নতুন নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে নিজেদের এবং সমাজের সকলের জীবন ও জীবিকার মান বদলে দেবে। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট বা কম্পিউটারের মাধ্যমে তারা সমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকবে; সরকারি ও বেসরকারি খাত প্রদত্ত পণ্য ও সেবা গ্রহণ করবে; দেশ-বিদেশের অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন ঋদ্ধ করে তুলবে। প্রযুক্তির মাধ্যমে তারা নিজেদের সমস্যা সমাধান করবে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে।

স্মার্ট অর্থনীতি

স্মার্ট অর্থনীতি ধর্ম, বর্ণ, জাতি, নারী-পুরুষ, শিক্ষা অথবা ভৌগোলিক দূরত্বনির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ নিশ্চিত করবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবটিকসের ব্যবহার হবে কৃষি, শিল্প, সেবা সকল খাতে; ক্ষুদ্র-কুটির, মাঝারিসহ সকল ব্যবসার পরিবেশ সহজ করা হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে দেশে উদ্ভাবিত সাশ্রয়ী প্রযুক্তি শিল্প-বাণিজ্যে প্রয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্র সহায়তা করবে। কমিয়ে ফেলা যাবে কায়িক শ্রম; সম্পদের হবে সুষ্ঠু ব্যবহার; কমবে অপচয়; বাড়বে উৎপাদনশীলতা; খরচ কমবে উৎপাদনের; উৎপাদন হয়ে উঠবে প্রতিযোগিতামূলক; প্রসারিত এবং বৈচিত্র্যময় হবে অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজার। তথ্যপ্রযুক্তি সহযোগে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে নেওয়া যাবে ত্বরিত ও তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত; সহজে করা যাবে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা; ব্যবস্থাপনা হয়ে উঠবে দক্ষ।

স্মার্ট সরকার

প্রযুক্তির ব্যবহার সরকার পরিচালনা ব্যবস্থাকে দক্ষ, কার্যকর এবং সাশ্রয়ী করে তুলবে, সর্বোপরি সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করবে। সরকারের প্রতিটি সিদ্ধান্তই হবে জ্ঞানভিত্তিক ও তথ্যনির্ভর; প্রতিটি সেবা হবে চাহিদা অনুযায়ী এবং সমন্বিতভাবে। আইওটি, মেশিন লার্নিং, ক্লাউড কম্পিউটিং ইত্যাদি প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে স্মার্ট নাগরিকদের স্মার্ট প্রতিনিধির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সরকার পরিচালনার সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করবে। সরকার তথা রাষ্ট্র হয়ে উঠবে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক।

স্মার্ট সমাজ

স্মার্ট বাংলাদেশের প্রযুক্তির মাধ্যমে দূর করা যাবে সব রকম সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য। অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট সমাজে নাগরিকেরা জ্ঞানচর্চা ও প্রয়োগের সুযোগ পাবেন অনেক বেশি। সঠিক তথ্যপ্রবাহের ফলে কমে যাবে ভুল ও মিথ্যা তথ্য প্রচারের মাধ্যমে অনৈতিক সুযোগ। প্রযুক্তি ব্যবহার সংস্কৃতিচর্চা, বিনোদন ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের সময় ও সুযোগ বৃদ্ধি করবে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রযুক্তি সক্ষমতা একান্ত প্রয়োজন। শিল্প উৎপাদনের নতুন ধারায় তুলনীয় সক্ষমতা ছাড়া গ্লোবাল ভ্যালু চেইনে সম্পৃক্ত থাকা সম্ভব নয়। দূরদর্শী নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানান; যার সাফল্যের ভিত্তিতে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ অপ্রতিরোধ্য গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনের জন্য আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজ অব্যাহত রাখবে এবং সমন্বয় সাধন করবে।

৩.২ সুশাসন

ক. গণতন্ত্র, নির্বাচন ও কার্যকর সংসদ

বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের অংশ হিসেবে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দীর্ঘ সাত দশকের বেশি সময় ধরে গণতান্ত্রিক সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দীর্ঘ ৪৩ বছর ধরে এদেশে গণতান্ত্রিক সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব তাঁর। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ আজ এগিয়ে চলছে। গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ নির্বাচন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর খুনি ও তাদের সুবিধাভোগী অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীরা অবৈধ ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছিল। এদেশে সকল অসাংবিধানিক, স্বৈরতান্ত্রিক এবং তাদের লিগ্যাসি শক্তিকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই উৎখাত করা হয়েছে।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- নির্বাচন কমিশনকে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ও শক্তিশালীকরণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিতকরণ, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের উদ্যোগে ৮২টি আমূল সংস্কার করা হয়েছে।
- নিরপেক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদ আইন পাস করেছে। উক্ত আইনের বলে গঠিত সার্চ কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের নামের তালিকা রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করে। রাষ্ট্রপতি সেই তালিকা থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশন সদস্যদের নিয়োগ দেন। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিতকরণে এটি একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ।

- আওয়ামী লীগ সরকারের সময় প্রণীত বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯-এর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সকল প্রশাসনিক, আর্থিক, আইনি, রেগুলেটরি ও লেজিসলেটিভ এবং নীতি প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশন বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে একটি স্বাধীন কর্তৃপক্ষ এবং এটি কোনোভাবেই সরকারের মুখাপেক্ষী নয়।
- আওয়ামী লীগ সরকারের উদার ও গণতান্ত্রিক মনোভাব এবং আইনের শাসনের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাশীল থাকার কারণে পূর্ববর্তী সরকারগুলোর দলীয়করণের ধারাবাহিকতার বিপরীতে দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দলনিরপেক্ষভাবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আইনের শাসনের নীতি অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করছে।
- ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার চিহ্নিত ও বাতিল করা, ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ন, ভোটার আইডি কার্ড প্রদান এবং স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স প্রবর্তন ইত্যাদি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবায়িত হয়েছিল।
- আওয়ামী লীগ সরকারের বিগত তিন মেয়াদে জাতীয় সংসদই সকল রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। নির্বাহী বিভাগের সকল কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের সক্রিয় ভূমিকা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে নিয়মিত অংশগ্রহণ, আন্তর্জাতিক মানের সংসদীয় রীতিনীতির চর্চা প্রভৃতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিচ্ছে।
- কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন (সিপিএ)-এর চেয়ারপারসন হিসেবে আমাদের স্পিকার এবং ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের (আইপিইউ) প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমাদের একজন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় এটি প্রমাণিত যে, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং এদেশের গণতন্ত্রের মানের প্রতি বিশ্ববাসীর আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- রাষ্ট্র পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, সুশাসন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা সুপ্রতিষ্ঠা করা হবে।
- শিক্ষিত, দক্ষ, চৌকস ও দুর্নীতিমুক্ত মানুষদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী করে তোলা হবে।

খ. আইনের শাসন ও মানবাধিকার সুরক্ষা

জাতির পিতার নেতৃত্বে প্রণীত স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে সাম্য, ন্যায়বিচার, মৌলিক মানবাধিকার ও আইনের শাসনের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭৫ সালে সপরিবারে জাতির পিতাকে হত্যার পর থেকে আইনের শাসনের পরিবর্তে এদেশে বিচারহীনতার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা ৪৩ বছর ধরে এদেশে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের চার মেয়াদে দেশের সকল পর্যায়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- সংবিধানের একাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে অধিকতর নিশ্চিত ও সুদৃঢ় করা হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে উচ্চতর আদালতে বিচারক নিয়োগে প্রধান বিচারপতির মতামত নেওয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। নিম্ন আদালতে বিচারক নিয়োগের লক্ষ্যে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন গঠন করা হয়।

- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২ অনুযায়ী বিচার বিভাগকে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করার যে প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে, সেটি বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সরকারের সময়েই পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অসাংবিধানিক ও অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ সাংবিধানিকভাবে চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
- এদেশে অসাংবিধানিক ও অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীরা আইনের শাসনের পথ বন্ধ করতে খুনিদের বিচার শুধু বন্ধই করেনি, তাদের পুরস্কৃতও করেছে। এই বিচারহীনতার সংস্কৃতি বন্ধ করে আওয়ামী লীগ আইনের শাসনের নীতি প্রতিষ্ঠিত করেছে।
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য সহায়ক বিচারকদের যৌক্তিক বেতনকাঠামো ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বিচার প্রাপ্তির লক্ষ্যে গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠা, বিরোধ নিষ্পত্তিতে বিকল্প পদ্ধতির ব্যবহার, দুস্থ মানুষের জন্য আইনি সহায়তার জন্য প্রতি জেলায় লিগ্যাল এইড ব্যবস্থা প্রবর্তন, বিচারকদের উন্নত প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ এবং বিচারিক কার্যক্রম ও বিচার প্রশাসনে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ই-গভর্ন্যান্স কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে বিচার বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে।
- জাতির কলঙ্ক মোচনের চেষ্টার অংশ হিসেবে সপরিবারে জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের অন্যান্য সাফল্যের মধ্যে রয়েছে—মুক্তিযুদ্ধকালে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার, ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলার বিচার, সন্ত্রাসী ও জঙ্গি কর্মকাণ্ডে যুক্ত অপরাধীদের বিচার। জাতির পিতার হত্যাকারীদের দেশে ফিরিয়ে এনে দণ্ড কার্যকরের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
- মানবাধিকার পরিস্থিতি সন্তোষজনক বিবেচনায় বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশ তিনবার জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছে।
- দেশি-বিদেশি কিছু স্বার্থান্বেষী মহল কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের মিথ্যা প্রচারণা করে আসছে। তা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ সরকার দল, মত, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গনির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের মানবাধিকার সুরক্ষায় সব সময় সচেষ্ট ছিল।
- আওয়ামী লীগ সরকার সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাসহ সকল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ ও কনভেনশনের বিধানাবলি যথাযথ গুরুত্বের সাথে প্রতিপালন করে আসছে। এ সকল সনদ ও কনভেনশনের আওতায় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যথাযথ ফোরামে নিয়মিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করে আসছে। সরকার মানবাধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে শ্রমিক, শিশু, নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশনে স্বাক্ষর, অনুস্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে এবং বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।
- জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদানের জন্য 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০' প্রণয়ন করা হয়েছে। বিগত ১৫ বছর এই আইনের আওতায় আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থসামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীদের সম্পূর্ণ সরকারি অর্থ ব্যয়ে আইনি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশ ভয়ভীতি ও বৈষম্য দূর করে নিরাপদ জীবন নিশ্চিত ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির অন্যতম লক্ষ্য 'ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার' প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
- ২০০৯ সালে মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকার প্রত্যেক নাগরিকের মানবিক মর্যাদা, সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্ত করে জাতীয় মানবাধিকার

কমিশন সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করে, যা যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কারাগার, হাসপাতাল, শিশুসদন পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্টদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য সুপারিশ করে, যা সরকার গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

আমাদের অঙ্গীকার

- সর্বজনীন মানবাধিকার সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের যেকোনো চেষ্টা প্রতিহত করার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।
- বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে বহির্বিশ্বে যে প্রোপাগান্ডা (Propaganda) এবং মিসরিপ্রেজেন্টেশন (Misrepresentation) রয়েছে, সে বিষয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা হবে।
- মহান সংবিধানকে সমুন্নত রেখে মানবাধিকার নিশ্চিত করা হবে।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীনতা এবং কার্যকারিতা সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

গ. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ

গণতন্ত্র, সুশাসন, জবাবদিহি ও উন্নয়নের সঙ্গে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিবিড়ভাবে জড়িত। গণমাধ্যম রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃত। তাই মুক্ত গণমাধ্যম ও অবাধ তথ্যপ্রবাহের চর্চাকে পাশ কাটিয়ে বা নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমের মাধ্যমে কোনো রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব নয়। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানোর পাশাপাশি মুক্ত গণমাধ্যম জাতিকে আলোর পথ দেখাতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার অবাধ তথ্যপ্রবাহ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। বিগত ১৫ বছরে গণমাধ্যমের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। এই ধারা ভবিষ্যতে বজায় রাখা হবে।

> "স্বাধীন, নিরপেক্ষ, গণমুখী ও বিশ্বাসযোগ্য গণমাধ্যম গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। আমরা গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছি।"
>
> – জননেত্রী শেখ হাসিনা

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- সরকারের গণমাধ্যমবান্ধব নীতির সুবাদে সারাদেশে বিপুলসংখ্যক পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। দেশে বর্তমানে মিডিয়াভুক্ত পত্রপত্রিকার সংখ্যা সাত শর বেশি।
- গণমাধ্যম নীতির কল্যাণে এ পর্যন্ত ৪৫টি বেসরকারি টিভি চ্যানেল, ২৭টি এফএম বেতার ও ৩১টি কমিউনিটি বেতারকে লাইসেন্স এবং ১৪টি আইপি টিভির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

- গণমাধ্যমকে আরও গণমুখী করতে জাতীয় অনলাইন নীতিমালা অনুসরণে এ পর্যন্ত ১৮৫টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং দেশের প্রতিষ্ঠিত ১৮২টি দৈনিক পত্রিকার অনলাইন নিউজ ভার্সনকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
- বর্তমানে দেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশের পত্রিকা/টিভি চ্যানেলগুলোতে বিরোধী দলের কর্মসূচি, মতামত স্বাধীনভাবে প্রচারিত হচ্ছে। এছাড়া টিভি চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচারিত টক শো, আলোচনা, বিতর্কসহ নানা অনুষ্ঠানে আলোচকেরা স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করেন। এ ধরনের স্বাধীন মতপ্রকাশে সরকার কখনো হস্তক্ষেপ করে না বা কোনো ধরনের বাধার সৃষ্টি করে না।
- সকল সাংবাদিক হত্যার দ্রুত বিচার করে প্রকৃত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা এবং সাংবাদিক নির্যাতন, তাদের প্রতি ভয়ভীতি-হুমকি প্রদর্শন ইত্যাদি বন্ধ করা হয়েছে।
- বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার কর্তৃক গণমাধ্যম দলীয়করণ এবং গোষ্ঠীবিশেষের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহের পরিপন্থী ছিল। বিপরীতে বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের আমলে রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যমে একতরফা দলীয় প্রচার বন্ধ এবং রাজনৈতিক কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারী শিল্পী-কলাকুশলীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অবসান করা হয়েছে।
- সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বিতরণে বৈষম্যমূলক নীতি, দলীয়করণ বন্ধ এবং সংবাদপত্রকে শিল্প হিসেবে বিবেচনা করে তার বিকাশে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
- গণমাধ্যমকর্মীদের কল্যাণে সরকারি অনুদানে পরিচালিত বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় ১৩ হাজার ৫১০ জন সাংবাদিককে প্রায় ৪০ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- করোনাকালীন আর্থিক সহায়তা হিসেবে ৭ হাজার ৯২৯ জন সাংবাদিককে প্রায় ৮ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- আওয়ামী লীগ সরকার স্বাধীন ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করেছে এবং এই ধারা অব্যাহত রাখবে।
- আওয়ামী লীগ সরকার সাংবাদিক হত্যার বিচার ত্বরান্বিত এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পদক্ষেপ নিয়েছে। সাংবাদিক নির্যাতন, তাদের প্রতি ভয়ভীতি-হুমকি প্রদর্শন এবং মিথ্যা মামলা রোধ করা হবে।
- আওয়ামী লীগ সরকার ডিজিটালাইজেশন নীতির আলোকে সংবাদপ্রবাহে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সমর্থন করে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের পরিবর্তে নতুন প্রণীত আইন 'সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩' অনুযায়ী ব্যক্তির গোপনীয়তা ও তথ্য সংরক্ষণ করা হবে এবং অপব্যবহার রোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।
- সাংবাদিকদের জন্য নবম ওয়েজ বোর্ডের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দশম ওয়েজ বোর্ড গঠনের মাধ্যমে সাংবাদিকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সময়োপযোগী করার ধারা অব্যাহত থাকবে। ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়নে বৈষম্য মেনে নেওয়া হবে না।
- সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় সাংবাদিকদেরকে আর্থিক ও চিকিৎসা সহায়তাকে আরও সম্প্রসারণ করা হবে।
- জাতীয় প্রেসক্লাবের অবকাঠামোগত উন্নয়নে ও অন্যান্য সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি করা হবে।
- সুষ্ঠু ও সুষম বিজ্ঞাপন বণ্টন নীতি অব্যাহত রাখা হবে।

ঘ. জনকল্যাণমুখী, জবাবদিহিমূলক, দক্ষ ও স্মার্ট প্রশাসন

নাগরিককেন্দ্রিক, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, জ্ঞানভিত্তিক, কল্যাণমুখী, উপাত্তনির্ভর, স্বয়ংক্রিয় এবং সমন্বিত দক্ষ স্মার্ট প্রশাসন গড়ার মাধ্যমে জনগণকে উন্নত ও মানসম্মত সেবা প্রদান এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অঙ্গীকারবদ্ধ।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- জনগণকে উন্নত ও মানসম্মত সেবা প্রদান এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আওয়ামী লীগ সরকার ধারাবাহিকভাবে নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এর ফলে ইতোমধ্যে সরকারি সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে; কম সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে ও ভোগান্তি ছাড়া সেবা প্রদান করা যাচ্ছে এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে স্বপ্রণোদিতভাবে সেবা প্রদানের মনোভাব গড়ে উঠেছে।
- প্রশাসনের সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে সরকারের তথ্যসমূহ বিভিন্ন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।
- নাগরিকগণ যেন তাদের তথ্যসমূহ সমন্বিতভাবে একটিমাত্র প্ল্যাটফর্মে পেতে পারে, সেজন্য জন্মনিবন্ধন-জাতীয় পরিচয়পত্র-পাসপোর্ট-এর মধ্যে ইন্টিগ্রেশনের কাজ শুরু হয়েছে।
- প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতিতে মেধা, সততা, যোগ্যতা, কর্মনিষ্ঠা, দক্ষতা, ন্যায়পরায়ণতা, শৃঙ্খলাবোধ প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।
- বৈশ্বিক সংকটের সঙ্গে বৃদ্ধি পাওয়া জীবনযাত্রার মান সমন্বয়ের নিমিত্তে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিশেষ প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে এবং গৃহঋণ বাবদ সরল সুদে ৭৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।
- উদ্যোগী ও জনবান্ধব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক, কর্মক্ষেত্রে সততা এবং অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারীদের অর্থ পুরস্কারসহ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের মাধ্যমে দক্ষ, উদ্যোগী, তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর, দুর্নীতিমুক্ত, দেশপ্রেমিক ও জনকল্যাণমুখী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলমান থাকবে।
- নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অধিকতর তৎপরতা বাড়িয়ে দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং সর্বপ্রকার হয়রানির অবসান ঘটানোর কাজ চলমান থাকবে।
- দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন বেতনকাঠামো নির্ধারণ করা হবে।

ঙ. জনবান্ধব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গড়ে তোলা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর থেকে আধুনিক, উন্নত, মানবিক ও জনবান্ধব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টার কারণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহের নিয়মিত অভিযানে সন্ত্রাসী জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হয়েছে।
- বাংলাদেশ পুলিশের ক্যাডার কাঠামো পুনর্গঠন করে বিদ্যমান ও নতুন পদসহ মোট ৩ হাজার ১২৩টি পদ সৃজন করা হয়েছে।
- পুলিশ, আনসার ও ভিলেজ ডিফেন্স বাহিনীতে নারীদের যোগদানের সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- সকল পর্যায়ের পুলিশের রেশন, পোশাক ও অন্যান্য ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্টাফ কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতো বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সেবাসমূহ পর্যায়ক্রমে ডিজিটাল করা হচ্ছে। অনলাইন জিডি কার্যক্রম চালু হয়েছে। ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন চালু করা হচ্ছে। পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটের জন্য 'ই-সার্ভিস' চালু করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে জনবলকাঠামো পুনর্গঠন করে ৩ হাজার ৯৪টি পদ সৃজন করা হয়েছে, ৪৮৪ জন ব্যাটালিয়ন আনসার নিয়োগ করাসহ ৩ হাজার ১০৭ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।
- সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন ও অপরাধের বিচারের লক্ষ্যে 'সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩' প্রণয়ন করা হয়েছে।
- সরকারের গৃহীত নীতিকৌশলের ফলে সুন্দরবন দস্যুমুক্ত হয় এবং চরমপন্থীদের দৌরাত্ম্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে। উপকূলীয় এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, মাদক চোরাচালান, মানব পাচার, জলদস্যু ও বনদস্যুদের দমনে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ৮ হাজার ১৯৭ জন সদস্য নিয়োগ ও ৪ হাজার ২৮২টি নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে।
- ১৬০টি নতুন বিওপি নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরও ৬৪টি নতুন কম্পোজিট বিওপি নির্মাণাধীন রয়েছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে পরিবর্তিত বাস্তবতা ধারণ করার উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা হবে। স্মার্ট বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে স্মার্ট ও আধুনিক হিসেবে গড়ে তোলা হবে।
- জনবান্ধব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাব, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কোস্ট গার্ড এবং বিজিবির দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে এসব বাহিনীর জনবল, ভৌত অবকাঠামো, লজিস্টিকস্ ও যানবাহন, আধুনিক প্রশিক্ষণ সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ধারা চলমান থাকবে।
- মাদক নির্মূল, সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধ ও দমন, মানি লন্ডারিং, গুজব প্রতিরোধ, মানব পাচার রোধসহ উগ্র জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসবাদ দমনের লক্ষ্যে চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে।

- ডোপ টেস্ট নীতিমালা/বিধিমালা প্রণয়ন করা হবে। বিজ্ঞানভিত্তিক তদন্ত (Scientific Investigation)-এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আরও অধিকসংখ্যক আধুনিক ডিএনএ ল্যাব, ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- সীমান্ত সড়ক নির্মাণ করা হবে, যাতে করে সীমান্ত সুরক্ষাসহ যেকোনো ধরনের সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা 'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' হিসেবে কর্মরত বিজিবি সদস্যদের জন্য সহজতর হয়।

চ. দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং জাতির নৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হলো দুর্নীতি। দুর্নীতির কারণে দেশের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয় না। কেবল আইন প্রয়োগ ও শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন করা সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। আওয়ামী লীগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সমাজ তথা রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করা হবে।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- জননেত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছেন। ফলে সমাজে দুর্নীতির মাত্রা বর্তমানে ক্রমহ্রাসমান।
- বিভিন্ন সেক্টরে ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং জনগণের ভোগান্তি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে দুর্নীতিসংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ দুর্নীতি দমন কমিশনের টোল ফ্রি নম্বর ১০৬-এর মাধ্যমে জনগণ যেকোনো স্থান থেকে বিনা খরচে জানতে পারছে।
- দুর্নীতি দমন কমিশনের চাহিদা মোতাবেক বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করা হয়েছে।
- রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধের নিমিত্ত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন, নাগরিক সনদ রচনা, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অব্যাহত থাকবে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে দুর্নীতি মোকাবিলায় কার্যকর পন্থা ও উপায় নির্বাচনপূর্বক তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- জ্ঞাত আয় বহির্ভূত অবৈধ সম্পদ অর্জন, ঘুষ, ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বজনপ্রীতি, পেশিশক্তির দৌরাত্ম্য ও দুর্বৃত্তায়ন নির্মূলে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ চলমান থাকবে।
- প্রশাসনে দুর্নীতি নিরোধের জন্য ভূমি প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, আদালত, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবাসহ সকল ক্ষেত্রে সূচিত তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ করা হবে।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী মনোভাব গড়ে তোলার জন্য পাঠ্যক্রমে দুর্নীতির কুফল ও দুর্নীতি রোধে করণীয় বিষয়ে অধ্যায় সংযোজন করা হবে।

ছ. সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা

বিএনপি-জামায়াত জোটের ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত ও সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ উন্নয়ন এবং জনগণের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার প্রধান বাধা, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও নৃ-গোষ্ঠীর জীবনের প্রতি হুমকি। বিএনপি-জামায়াত জোট দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত এবং আন্দোলনের নামে অরাজকতা, অগ্নিসন্ত্রাস ও হত্যা এবং শান্তিবিনাশী অপরাধ করে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ সন্ত্রাস দমন, সকল নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সুদৃঢ় নেতৃত্বে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে, যা জনজীবনে স্বস্তি এনেছে এবং বিশ্বসম্প্রদায়ের প্রশংসা পেয়েছে।
- ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে হত্যার উদ্দেশ্যে গ্রেনেড হামলা মামলার রায় বাস্তবায়িত হয়েছে।
- সাম্প্রদায়িক উসকানি প্রতিরোধ করে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' নীতি অনুসরণ করছেন।
- আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত 'আইন সংস্কার কমিশন' দ্রুত বিচারকার্য সম্পন্নের জন্য আইন সংস্কারের সুপারিশ করেছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- রাষ্ট্র পরিচালনায় সংবিধানের প্রাধান্য, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠন সুনিশ্চিত করা হবে।
- আওয়ামী লীগ শান্তিপূর্ণ ও আইনি পন্থায় সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধে সকল মত ও পেশার জনগণকে সম্পৃক্ত করবে।
- জোট সরকারের আমলে সংঘটিত সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড—প্রায় ৬০০ স্থানে একই সময়ে বোমাবাজি, অগ্নিসংযোগ, গ্রেনেড হামলা সুষ্ঠুভাবে তদন্ত ও প্রচলিত আইনে বিচার কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে আছে এবং বিচার সম্পন্ন করার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা হবে।
- সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারী শাস্তিপ্রাপ্ত বিদেশে পলাতক আসামিদের দেশে ফিরিয়ে এনে রায় বাস্তবায়নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

জ. স্থানীয় সরকার

'শেখ হাসিনার মূল নীতি, গ্রাম শহরের উন্নতি' এই প্রত্যয় সামনে রেখে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে একটি দক্ষ, জবাবদিহিমূলক ও সেবামুখী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলাই সরকারের মূল লক্ষ্য। গ্রাম-শহরের ব্যবধান হ্রাস করে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সমান সুবিধা নিশ্চিত করা ছিল আওয়ামী লীগের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগ সরকার 'আমার গ্রাম—আমার শহর'সহ বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নাগরিক সুবিধাদির অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে গ্রাম ও শহরে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কার ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে সড়ক নেটওয়ার্ক কাভারেজ বর্তমানে ৩৯.৪২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। গ্রামের পাশাপাশি শহর অঞ্চলে সড়ক, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।
- বিগত ১৫ বছরে পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থায় দৃশ্যমান উন্নতি সাধিত হয়েছে। ঢাকা ওয়াসার সিস্টেম লস ২০০৯ সালে ছিল ৪০ শতাংশ, যা বর্তমানে ২২.২৯ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী, বস্তিবাসীসহ সকল নগরবাসীকে সুপেয় পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে ঢাকা ওয়াসার মাধ্যমে 'ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- ৯৮.৮ শতাংশ মানুষের জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। ৯৭.৩২ শতাংশ মানুষ পয়োনিষ্কাশনের সুবিধা ভোগ করছে।
- সারাদেশে ৫৫ হাজারের বেশি নিরাপদ পানির উৎস এবং ওয়াশ ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। শতভাগ জনগণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও উন্নত স্যানিটেশন প্রদানের লক্ষ্যে 'সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ' প্রকল্পের আওতায় ৬ লক্ষ নিরাপদ পানির উৎস স্থাপনের কাজ চলমান আছে।
- বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ ভাগ নগর এলাকায় (সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায়) বাস করে। বিগত ১৫ বছরে নতুন ৫টি সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহকে অনলাইনভিত্তিক করা হচ্ছে।
- জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ঢাকা শহরের ২৬টি খালের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ঢাকা ওয়াসা থেকে দুই সিটি কর্পোরেশনের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।
- চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে ৩৬টি খাল পুনঃখনন এবং ২৪টি খাল পাড়ের রিটেইনিং ওয়াল এবং ৫৪টি ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ইউনিয়ন পরিষদ আইনকে আরও যুগোপযোগী ও সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইন, ২০২৩ সংশোধনের কাজ চলছে।
- ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহে রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনয়নের মধ্য দিয়ে মনোনয়ন প্রথা প্রবর্তন ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার সমুন্নত রাখা হয়েছে।
- উপজেলা পরিষদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল, ২০২২ এবং পরিষদ কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- আমিনবাজার ল্যান্ডফিলে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নির্মাণকাজ চলছে। তাছাড়া সিলেট ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনেও বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কাজ চলছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- সড়ক, ব্রিজ, কালভার্ট, সাইক্লোন শেল্টার ইত্যাদির অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংরক্ষণের কাজ প্রয়োজন অনুযায়ী অব্যাহত থাকবে।

- নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা আরও সমুন্নত করা হবে। ২০২৮ সালের মধ্যে পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে অধিকতর পরিবেশবান্ধব করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নগরের বিদ্যমান পয়োনিষ্কাশন সুবিধা ২০ শতাংশ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে শতভাগে উন্নীতকরণের জন্য ৫টি পয়োশোধনাগার নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।
- গ্রামাঞ্চলে নিরাপদ পানির উৎস নির্মাণ, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপন এবং প্রতিটি বাড়িকে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় আনার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন করা হবে।
- ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদসহ পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের সক্ষমতা এবং স্বায়ত্তশাসনের পরিসর অধিকতর বৃদ্ধি করা হবে।
- সমগ্র বাংলাদেশে খাল, নদী, পুকুর, ডোবা, হাওর, বাঁওড়সহ সকল জলাশয় খনন করে জলাধারগুলো উন্নত করার কাজ চলমান থাকবে।
- কেন্দ্রীয় বাজেটের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিভিন্ন স্তরে স্থানীয় সরকার কর্তৃক বাজেট প্রণয়ন এবং সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।
- আর্থিকভাবে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ন্যায্য ও দক্ষ রাজস্ব বিভাজন প্রক্রিয়া সম্প্রসারণ করা হবে।
- কেন্দ্রীয় সরকারের যে সকল কাজ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে অর্পণযোগ্য, তা হস্তান্তরের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে দায়িত্ব বিভাজন অধিকতর স্পষ্ট করা হবে।

ঝ. ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা

ভূমির স্বল্পতা, ব্যবস্থাপনাগত দীর্ঘসূত্রতা ও জটিলতার কারণে ভূমি ব্যবস্থাপনায় পূর্ণ সুশাসন নিশ্চিত করার চাহিদা দীর্ঘদিনের। প্রশাসনিক সংস্কার ও আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার ভূমিসংক্রান্ত সমস্যাদির কার্যকর সমাধানের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। Land Development Tax Management System-এর মাধ্যমে ৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত ৬১টি জেলায় ১ জুলাই ২০১৯ থেকে শতভাগ ই-নামজারি নিশ্চিত করা হয়েছে। এই ৬১টি জেলায় ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় এবং হোল্ডিং এন্ট্রি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

ভ্রাম্যমাণ ভূমিসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে সীমিত পর্যায়ে ঢাকা শহরে বিভিন্ন স্পটে ই-নামজারি ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও সম্প্রসারণ করা হবে। ভূমিবিষয়ক তথ্যসেবা প্রদানের জন্য কল সেন্টার (১৬২২২) চালু করা হয়েছে। ডাক বিভাগ দেশে-বিদেশে বাংলাদেশি নাগরিকদের ঠিকানায় ডেলিভারি চার্জের বিনিময়ে খতিয়ান, মৌজা ম্যাপ পৌঁছে দিচ্ছে। সহকারী কমিশনারদের (ভূমি) জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ Land Information Management System (LIMS) সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে, যা তাদের অধিকাংশ কাজ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করতে সহায়তা করছে।

৩.৩ অর্থনীতি

ক. সামষ্টিক অর্থনীতি : উচ্চ আয়, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন

আওয়ামী লীগের আর্থসামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সংবিধান ও বঙ্গবন্ধুর সমাজ উন্নয়ন দর্শনেরই প্রতিফলন। গত দেড় দশকে বাংলাদেশ একটি গতিশীল ও দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মর্যাদা লাভ করেছে। জাতীয় আয়ের মানদণ্ডে বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের ৩৩তম অর্থনীতির দেশ। এসময়ে দেশের কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন পণ্য ও সেবা উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি বৃহৎ অভ্যন্তরীণ ভোক্তাবাজার সৃষ্টি হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে। মূলত সরকারের ধারাবাহিক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা রেখে চলছে।

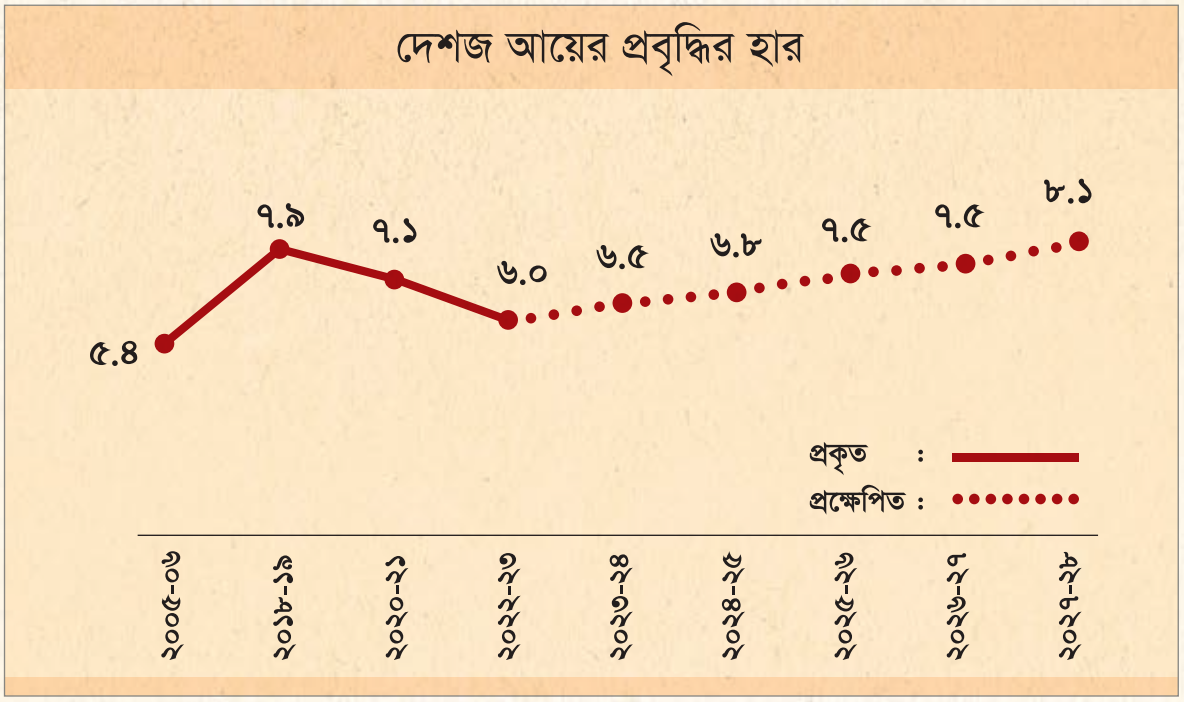

বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি বিগত ১৫ বছরে গড়ে ৬.৩০ শতাংশ হারে বেড়েছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের স্লোগান ছিল 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ'। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধির হার ৭.৮৮ শতাংশ অর্জিত হয়। ২০২০-২১ সালে বিশ্বব্যাপী কোভিড অতিমারি বাংলাদেশের জনজীবন ও অর্থনীতিকে বাধাগ্রস্ত করে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, কোভিড-১৯ চ্যালেঞ্জ এবং চলমান ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা ও যুদ্ধাবস্থা, বিশ্ব অর্থনীতির শ্লথগতি ও মন্দার মধ্যেও বাংলাদেশের দেশজ আয়ের প্রবৃদ্ধি বাড়তে থাকে (৩.৪৫ শতাংশ), যা অর্থনীতির সহনশীলতা ও সক্ষমতার পরিচায়ক। পরবর্তী বছরগুলোতেও বাংলাদেশ কমবেশি ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশজ আয় ১১ গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এসময়ে অর্থনৈতিক কাঠামোতেও গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে। জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান প্রায় ১১ শতাংশ, শিল্পের ৩৮ শতাংশ এবং সেবা ৫০ শতাংশ হয়েছে। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশ এখন কৃষিপণ্য রপ্তানি করছে।

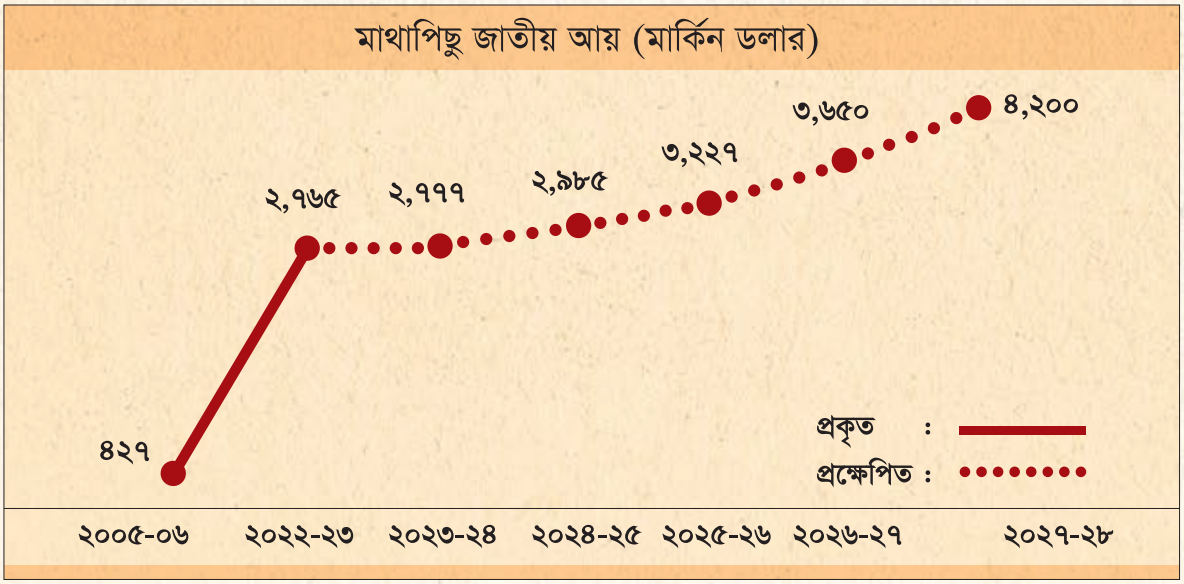

অপরদিকে, মূল্যস্ফীতি সর্বসাধারণের জন্য সহনীয় মাত্রায় রাখার ব্যাপারে সরকার সবসময়ই সজাগ ছিল, যা অর্থবছর ২০২১ বা পূর্ববর্তী পাঁচ বছর মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশের নিচে ছিল। বিশ্বব্যাপী মন্দার অভিঘাতে ডলারের মূল্য বেড়েছে; যার ফলে আমদানি করা পণ্য—গম, ভোজ্যতেল, জ্বালানি তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি), সার, তুলা, ডাল, চিনি প্রভৃতি পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি বাজারে চাপ সৃষ্টি করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বমন্দার অভিঘাত মোকাবিলা, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং জনদুর্ভোগ কমাতে বিলাসদ্রব্য আমদানি নিরুৎসাহিত করে, বিদেশি বিনিয়োগ সহজ করা, প্রবাসী আয় দেশে পাঠাতে বিশেষ প্রণোদনা, কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি, দেশের প্রতি ইঞ্চি জমি চাষের আওতায় এনে এবং প্রান্তিক ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য কম মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করে সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘব করেছেন।

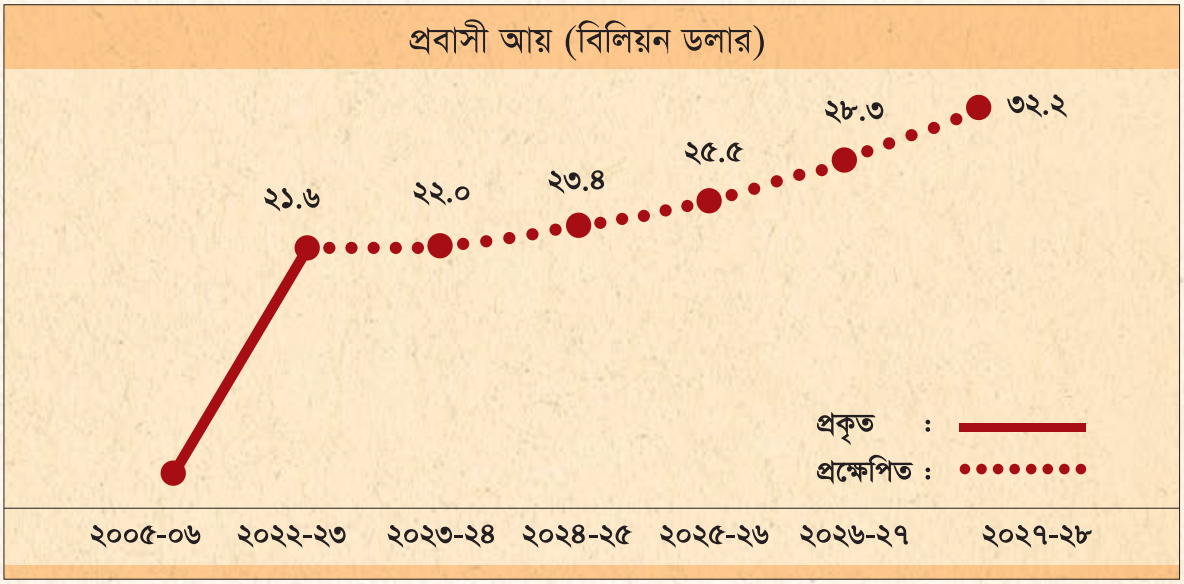

সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক মূল্যায়নে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে; ২০২১ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে। উন্নয়ন ও উচ্চ প্রবৃদ্ধির গতিধারা থেকে সুস্পষ্ট যে বাংলাদেশ উন্নয়ন, গণতন্ত্র, শান্তি ও সমৃদ্ধির মহাসড়কে অগ্রসরমাণ।

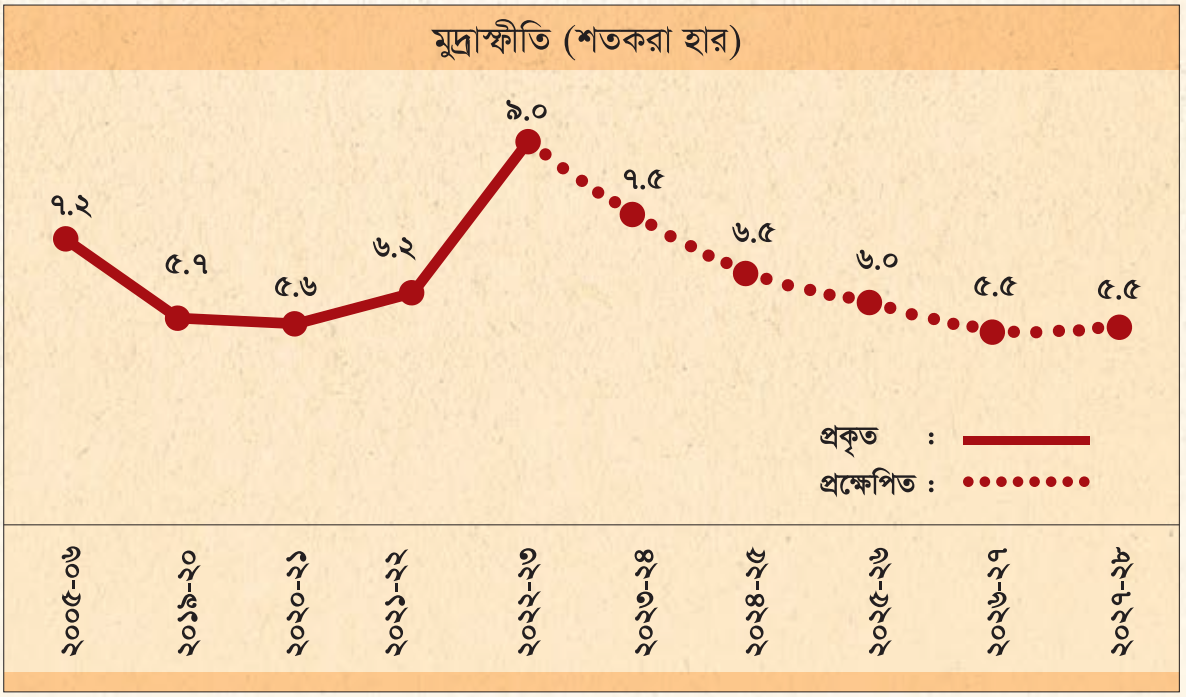

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- ২০০৫-০৬ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ছিল ১০.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫.৩ গুণ বেড়ে হয়েছে ৫৫.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিগত ১৫ বছরে রপ্তানি আয় ৫ গুণ এবং গড়ে ১৬.০ শতাংশ হারে রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। একই সময়কালে আমদানি ব্যয় প্রায় ৫ গুণ বৃদ্ধি পায়।
- আমদানি ও রপ্তানি নিবন্ধনের মেয়াদ এক বছর থেকে পাঁচ বছরে উন্নীত করা হয়েছে এবং নিবন্ধন কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- রপ্তানি উৎসাহিত ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নীতি সহায়তা ও প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে।
- যৌথ মূলধনী কোম্পানির নামের ছাড়পত্র ও এনটিটি প্রোফাইল ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে।
- ভোক্তা অধিকার আইন, ২০০৯ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে; ভোক্তা অধিকারসংক্রান্ত সমস্যাবলি সমাধানের জন্য সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।
- জলবায়ু পরিবর্তন, শিল্প কারখানার পরিবেশ, শ্রম অধিকার, সুশাসন ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখাসংক্রান্ত ৩২টি আন্তর্জাতিক চুক্তি ও কনভেনশন স্বাক্ষর/অনুস্বাক্ষর করা হয়েছে।

- আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণ প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং রেমিট্যান্স প্রণোদনা প্রদান ইত্যাদির ফলে বার্ষিক রেমিট্যান্স ২০০৫-০৬ সালের তুলনায় প্রায় ৪.৫ গুণ বৃদ্ধি পায়। রপ্তানি ও রেমিট্যান্সের ধারাবাহিক উচ্চপ্রবাহের কারণে বর্তমান সরকারের সময়ে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুত অর্থবছর ২০০৫-০৬ এর ৩.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০২০-২১ শেষে সর্বোচ্চ ৪৬.৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। চলমান অর্থনৈতিক সংকটের কারণে বৈদেশিক মুদ্রার মজুত কমে অর্থবছর ২০২২-২৩ শেষে ৩১.২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয় এবং অক্টোবর ২০২৩ শেষে ২৬.৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা দিয়ে প্রায় ৫ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব।
- মাথাপিছু আয় বর্তমানে উন্নীত হয়েছে ২ হাজার ৭৬৫ মার্কিন ডলারে, যা ২০০৫-০৬ সালে ছিল মাত্র ৪২৭ ডলার।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপি হয়েছে প্রায় ৪৪ লাখ ৩৯ হাজার কোটি টাকা, যা ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ছিল ৪ লক্ষ ৮২ হাজার কোটি টাকা, অর্থাৎ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তুলনায় জিডিপি এখন প্রায় ১০ গুণ।
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাজেটের আকার ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে তা ছিল ৬১ হাজার ৫৮ কোটি টাকা। এ সময়ে বাজেটের আকার বড় হয়েছে প্রায় সাড়ে ১২ গুণ। বাজেট ঘাটতি আশানুরূপভাবে জিডিপির ৫ শতাংশে সীমিত রাখা হয়েছে গত ১০ বছর।
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তুলনায় সাড়ে ৯ গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে জিডিপির ৩১.৬৮ শতাংশ, যা ২০০৫-০৬-এ ছিল ২৫.৮ শতাংশ। সরকারি বিনিয়োগ ২০০৫-০৬ সালের ৪.১৩ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৭.৬২ শতাংশ।
- রাজস্ব সংগ্রহের প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা হয়েছে, যার ফলে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে ক্রমবর্ধমান বাজেট বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হচ্ছে। মোট রাজস্ব আয় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪ লাখ ৩৩ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে, যা ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ছিল ৪৪ হাজার ২০০ হাজার কোটি টাকা।
- আয়বর্ধক কর্মসৃজন, শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ, নতুন বেতন স্কেল ও ১০ শতাংশ বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় অতিরিক্ত ৫ শতাংশসহ) ইত্যাদি কার্যক্রমের ফলে মানুষের প্রকৃত আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ২০০৯-১৮ সময়কালে বেতন ৩৪৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস (২০১৫-৩০) এবং ঋণাত্মক (২০২৫-৩০) হওয়ার ফলে সার্বিক জাতীয় আয়ের তুলনায় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার হবে উচ্চতর।

আমাদের অঙ্গীকার

আওয়ামী লীগ লক্ষ্য ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি-কৌশল গ্রহণ করবে। উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য হবে মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, যা কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্জিত হবে। আওয়ামী লীগ তরুণ ও যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

বৈদেশিক বাণিজ্য

- বিগত দেড় দশকে আওয়ামী লীগ সরকার বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ করেছে, যা আগামীতে অব্যাহত থাকবে।

- মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার পর শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহযোগিতা যাতে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, সে লক্ষ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য বাণিজ্য অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত থাকবে।
- ২০৩০ সাল নাগাদ রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ১৫০ বিলিয়ন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে, যা অর্জনের জন্য নতুন পণ্য ও বাজার বহুমুখী করা হবে।

- কৃষিজাত পণ্য, সি-ফুড, হালাল পণ্য ও সেবা, হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং, ওষুধশিল্প এবং আইটি সেবার গুণগত মান ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে।
- ভারত, চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে অংশীদারত্ব/মুক্ত বাণিজ্য/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে চলমান আলোচনা জোরদার করা হবে।
- দক্ষিণ আমেরিকার (মার্কুসোর ভুক্ত) দেশসমূহ, রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ, পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহের সঙ্গে বাণিজ্য সম্প্রসারণের সম্ভাবনা সম্পর্কে সমীক্ষা করে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে গবেষণা ও চুক্তি আলোচনার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

বাজার ব্যবস্থাপনা ও মূল্যস্ফীতি

- বাজারমূল্য ও আয়ের মধ্যে সংগতি প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- যেসব পণ্যের বাজার দেশীয় উৎপাদন ও সরবরাহকারীর ওপর নির্ভর করছে, সেগুলোর ন্যায্যমূল্য প্রতিষ্ঠা করা এবং ন্যায্যমূল্যে ভোক্তাদের কাছে পৌঁছানোর সর্বোচ্চ উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

- পণ্যমূল্য কমাতে উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য উন্নত প্রযুক্তির লভ্যতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা উৎসাহিত করার ধারা অব্যাহত থাকবে।
- মূল্যস্ফীতি হ্রাসের ফলে দ্রব্যমূল্য নিম্নমুখী হবে এবং সকলের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আসবে।

মুদ্রা সরবরাহ ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা

- মুদ্রা সরবরাহ ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায়-উপকরণ (ইনস্ট্রুমেন্ট) হবে নীতি সুদহার ব্যবহার।
- কর্মোপযোগী প্রশিক্ষিত যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ঋণ সরবরাহ সম্প্রসারণ করা হবে।
- ক্ষুদ্র কুটির ও মাঝারি শিল্প এবং নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ সহজলভ্য করা হবে।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকে পরিকল্পনামাফিক পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চিতি (রিজার্ভ) রাখা হবে এবং প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (রিয়াল ইফেকটিভ এক্সচেঞ্জ রেট) ও অভিহিত বিনিময় হার (নমিনালি এক্সচেঞ্জ রেট) সংগতিপূর্ণ করা হবে।
- আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা হবে, যা বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহে অনিশ্চয়তা লাঘব করবে।
- ব্যাংক ও আর্থিক খাত পরিচালনায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি, অর্থনীতিবিদ ও বিনিয়োগকারীদের পরামর্শ গ্রহণ ও সম্পৃক্ত করে প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- ব্যাংকসেবার দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে। ঋণ অনুমোদন ও বিতরণে দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইন প্রয়োগের ধারা অব্যাহত থাকবে।
- খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য আইন প্রয়োগ এবং ব্যাংকে বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি রাখার বাধ্যবাধকতা অব্যাহত থাকবে।

বিনিয়োগ ও উন্নয়ন

- ২০২৪-২০২৮ সময়কালে সঞ্চয় জাতীয় আয়ের ৩১ শতাংশ থেকে ৩৩ শতাংশে বৃদ্ধির পরিকল্পনা অনুসরণ করা হবে। একই সময়কালে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হবে জাতীয় আয়ের ৩২ শতাংশ থেকে ৩৪ শতাংশে।
- বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করার লক্ষ্যে বিধিবিধান সহজ এবং পদ্ধতিগত জটিলতা দূর করা হবে।
- বিনিয়োগ ও ব্যয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর বাবদ রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা দেশজ আয়ের ৯ শতাংশ থেকে ১১ শতাংশ করা হবে এবং সর্বমোট রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ১০ শতাংশ থেকে ১১.৫ শতাংশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।
- সরকারের বিনিয়োগ ও ব্যয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হবে মানবসম্পদ উন্নয়ন যথা– শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, যা আর্থিক কর্মকাণ্ডে সকল খাতের জন্য আবশ্যক।
- প্রকল্প নির্বাচন, ব্যয় নির্ধারণ ও সম্পন্ন প্রকল্পের মান নিরীক্ষা এবং সরকারি ক্রয় ও দরপত্র যাচাইয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নিশ্চয়তা বিধান অব্যাহত থাকবে। এই ধারা সংহত ও অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী আইন সংশোধন করা হবে।
- আওয়ামী লীগ অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি খাতের গুরুত্ব অব্যাহত রাখবে এবং যুক্তিসংগত ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ বিনিয়োগের সুযোগ ব্যবহার করবে।

- বিনিয়োগ উৎসাহিত এবং অধিক রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে সুসামঞ্জস্যভাবে শুল্ককর কাঠামো ও প্রশাসনিক সংস্কার করা হবে।
- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, নতুন পণ্য উৎপাদন ও নতুন রপ্তানি বাজার সৃষ্টি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শুল্ককর রেয়াত ও প্রণোদনা পুনর্বিন্যাসের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

আর্থিক খাতে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধের জন্য মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধিত ২০১৫) ও সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০১৩ পাস করা হয়েছে।
- অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন বিষয়ে কার্য পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) স্থাপন করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় সমন্বয় কমিটি প্রতিষ্ঠা করা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সচিবের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সদস্যদের নিয়ে কর্মসম্পাদন কমিটি গঠিত হয়েছে।
- ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অব মানি লন্ডারিং (এপিজি)-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে যোগদান করে। এপিজি মিউচুয়াল ইভ্যালুয়েশন সম্পন্ন হবার পর বাংলাদেশ কমপ্লায়েন্ট কান্ট্রি হিসেবে স্বীকৃত হয় এবং ঝুঁকিপূর্ণ তালিকা থেকে বের হয়ে আসে।
- ২০১৩ সালে বাংলাদেশ বিশ্বের ইন্টেলিজেন্স ইউনিটসমূহের আন্তর্জাতিক সংগঠন অ্যাডমন্ট গ্রুপ (Admont Group)-এ যোগদান করে। এই গ্রুপের ১৭০টি সদস্যদেশের সাথে অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন বিষয়ে তথ্য বিনিময়ের ব্যবস্থা চলমান রয়েছে।
- ব্যাংক অব ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট প্রণীত ২০২৩ সালের অর্থ পাচার সূচক ব্যাসেল এএমএল ইনডেক্স -এ বাংলাদেশের অবস্থান উন্নত হয়।
- ওভার ইনভয়েস ও আন্ডার ইনভয়েস রোধের লক্ষ্যে ঋণপত্র অনুমোদনসংক্রান্ত তথ্য পর্যবেক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- আর্থিক লেনদেনসংক্রান্ত অপরাধ এবং অন্যায় ও অবৈধ সুযোগ গ্রহণ কঠোরভাবে দমন করা হবে।
- রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তরে ঘুষ-দুর্নীতি উচ্ছেদ, অনুপার্জিত আয় রোধ, ঋণ-কর-বিলখেলাপি ও দুর্নীতিবাজদের বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান এবং তাদের অবৈধ অর্থ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
- খেলাপি ঋণ বারবার পুনঃ তফসিল করে ঋণ নেওয়ার সুযোগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। রুগ্‌ণ শিল্প-বাণিজ্য অবসায়নের জন্য দেউলিয়া এবং অন্যান্য আইন সংশোধন ও কার্যকর প্রয়োগের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। ব্যবস্থাপনা এবং ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন যাতে বস্তুনিষ্ঠ হয়, সেজন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে প্রভাবমুক্ত রাখা হবে।
- আমদানি-রপ্তানিতে আন্ডার ও ওভার ইনভয়েজ, শুল্ক ফাঁকি, বিদেশে অর্থ পাচার, হুন্ডির মাধ্যমে লেনদেন, মজুতদারি ও সিন্ডিকেটের মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি এবং অতি মুনাফা প্রতিরোধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।

- আওয়ামী লীগ সরকার মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধে যেসব আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করেছে, সেগুলো প্রয়োগ করে পুঁজি পাচার অপরাধীদের বিচারের অধীনে আনা হবে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের সহযোগিতায় পাচার করা অর্থ-সম্পদ ফেরত আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

খ. দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈষম্য হ্রাস

দারিদ্র্য একটি অভিশাপ, যা জাতির মেধা ও সৃজনশীলতা বিকাশে চরম অন্তরায়। দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের সাফল্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বহুল প্রশংসিত। দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মূলে রয়েছে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি সহায়ক (Inclusive Growth) নীতি ও কৌশল এবং ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি। তাই দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকার একদিকে ব্যক্তি খাতের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে, অন্যদিকে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় নিশ্চিত করা হয়েছে সম্পদের সুষম পুনর্বণ্টন।

> "স্বাধীন দেশের মানুষ পেট ভরে খেতে পাবে, পাবে মর্যাদাপূর্ণ জীবন; তখনই শুধু এই লাখো শহীদের আত্মা তৃপ্তি পাবে।"
>
> – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- 'খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২' প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশ ও অতি দারিদ্র্যের হার ৫.৬ শতাংশ। ২০০৫ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪০.০ শতাংশ ও অতি দারিদ্র্যের হার ছিল ২৫.১ শতাংশ।

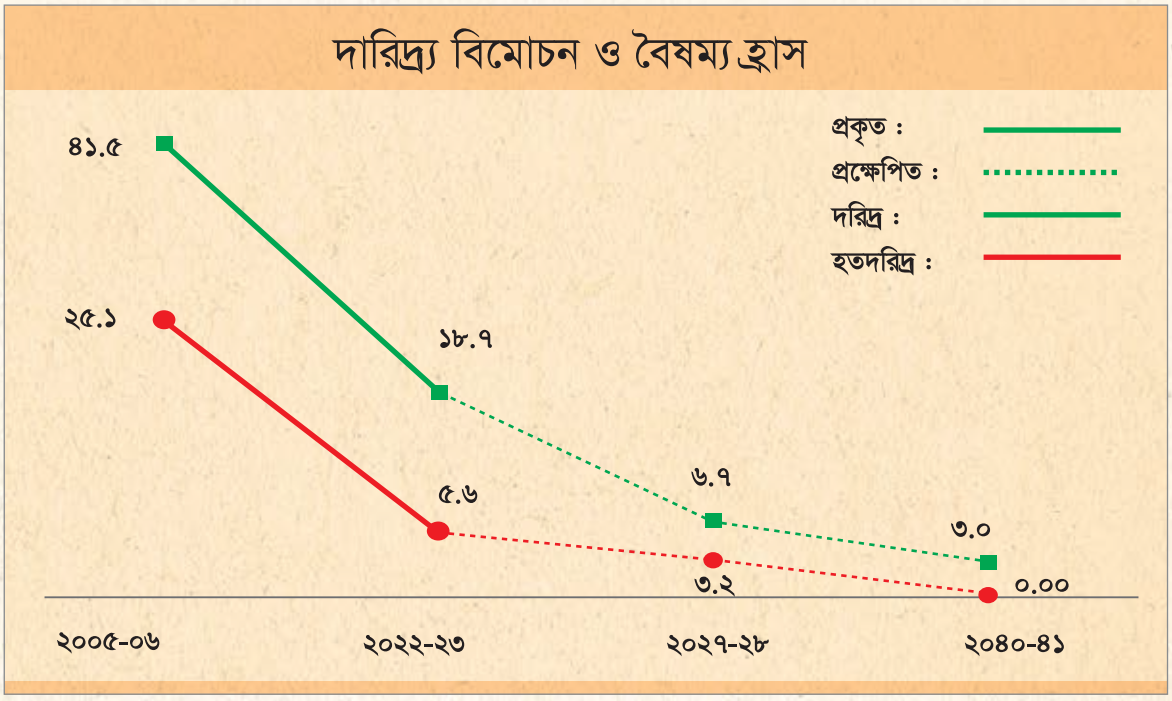

- ভোগের ভিত্তিতে বাংলাদেশে বৈষম্য ০.৩০-০.৩২ স্থিত হয়ে আছে, যা আয় বৈষম্যের প্রভাব লাঘব করেছে। অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন, ভোগ ব্যয়বৈষম্য পরিমাপে অধিকতর নির্ভরযোগ্য। অঞ্চলভিত্তিক অসমতা কমেছে, কমেছে গ্রাম ও শহরের ব্যবধান।
- বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না মর্মে মুজিববর্ষে ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সারাবিশ্বে শেখ হাসিনার এ ঘোষণা প্রশংসিত হয়েছে। ১৯৯৭ সাল থেকে এ যাবৎ গৃহহীনদের জন্য গ্রহণ করা আশ্রয়ণ এবং অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে ৮ লক্ষ ৪১ হাজার ৬২৩টি পরিবারকে ঘর ও জমি প্রদান করা হয়েছে, যার সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪২ লক্ষ ৮০ হাজারের বেশি।
- জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য পৃথিবীতে প্রথম বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয় মুজিববর্ষে। ১৯৯১ সালে ঘূর্ণিঝড়ে উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৪ হাজার ৪০৯টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।
- গৃহায়ণ তহবিল গঠন করে ঋণদানের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৪ হাজার ৬১২টি গৃহ নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকদের জন্য হোস্টেল এবং ছিন্নমূল পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে।
- ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত হয়েছে ২১টি জেলার মোট ৩৩৪টি উপজেলা।
- বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় কর্মসংস্থান এবং আয় বৃদ্ধির ফলে এক দিনের মজুরি দিয়ে একজন শ্রমিক ১০-১২ কেজি চাল কিনতে পারছে, বাংলাদেশের ইতিহাসে যা সর্বোচ্চ প্রকৃত মজুরি। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে এক দিনের মজুরি দিয়ে ক্রয় করা যেত মাত্র ৩ থেকে ৪ কেজি চাল। চালের মূল্যের সঙ্গে তুলনা করে (Rice Equivalent Wage) দেখা যায়, ১৫ বছরে প্রকৃত শ্রমিক মজুরি ৩ গুণের বেশি বেড়েছে। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার কমে আসার এ-ও অন্যতম কারণ।
- দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে আরও লক্ষ্যভিত্তিক ও সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তার খাতে মোট ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা জিডিপির ২.৫৫ শতাংশ। বর্তমানে দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈষম্য দূরীকরণে কার্যক্রমসমূহের মোট উপকারভোগীর সংখ্যা কমবেশি ১০ কোটি লোক।
- সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ২০০৬ সালে মোট ২ হাজার ৫০৫ কোটি টাকা (মোট বাজেটের ৪.০১ শতাংশ) বরাদ্দ ছিল, বর্তমানে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১ লক্ষ ২৬ হাজার ২৭২ কোটি টাকা (মোট বাজেটের ১৬.৫৮ শতাংশ) বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে; যা ২০০৬ সালের তুলনায় ৫০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ২০০৬ সালে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ২১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৩৫৬ জন, যা ২০২৩ সালে ৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১ কোটি ৮১ লক্ষ ২৩ হাজার ৫৫৪ জনে দাঁড়িয়েছে।
- ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর থেকে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করা হয়, যা মাসিক ১০০ টাকা হারে প্রদান করা হতো। ২০০৬ সালে ১৪ লক্ষ ৮৫ হাজার জন বয়স্ক ভাতা পেতেন, যা ২০২৩ সালে ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৮ লক্ষ ১ হাজার জনে দাঁড়িয়েছে, যারা প্রত্যেকে মাসিক ৬০০ টাকা হারে ভাতা পাচ্ছেন।
- বিধবা ও স্বামী নিগৃহীত ভাতাপ্রাপ্ত মহিলার সংখ্যা ২০০৬ সালে ছিল ৫ লক্ষ ২০ হাজার জন, যা ২০২৩ সালে ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২৬ লক্ষ জনে দাঁড়িয়েছে।

- ২০০৬ সালে প্রতিবন্ধী ভাতা পেত ৯৭ হাজার জন, যা ২৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩ সালে ২৯ লক্ষ ১৫ হাজার জনে দাঁড়িয়েছে।
- খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম ভিজিডি, ভিজিএফ, ভিডব্লিউবি, টিআর, জিআর, কাবিখা, কাবিটা, ইজিপিপি এবং ওএমএস-এর আওতায় ১১৪টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে উপকারভোগীর সংখ্যা ৪ কোটি ৬১ লক্ষ ১৫ হাজার ৭৫৬ জন। ২০০৬ সালে উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ৩০ হাজার জন, যা বর্তমানে ১০০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ভিজিডি কার্যক্রমের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২০০৬ সালে ছিল ৪ লক্ষ ৩০ হাজার জন, যা ২০২৩ সালে ১০ লক্ষ ৭৭ হাজার জনে দাঁড়িয়েছে।
- 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পের আওতায় ১ লাখ ২০ হাজার ৩২৫টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করে ৫৬ লাখ ৭৭ হাজার পরিবারকে উপকারভোগী হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। ২ হাজার ৮৬ কোটি টাকা সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় জমা, ২ হাজার কোটি টাকা কল্যাণ অনুদান ও ৩ হাজার ২০০ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল প্রদান এবং সমিতিগুলো ৪৯০ কোটি টাকা সেবামূল্য আদায় করেছে।
- অতি দারিদ্র্যপীড়িত এলাকাসহ (উত্তরাঞ্চল, উপকূলবর্তী এলাকা ও চরাঞ্চল প্রভৃতি) সারাদেশে 'অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান' প্রকল্পে বছরে গড়ে ১ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৮ লাখ মানুষের ৮০ দিনের কর্মসংস্থান করা হচ্ছে।
- ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার হতদরিদ্র পরিবারকে কর্মাভাবকালীন ৫ মাস ১০ টাকা দরে চাল বিতরণ করা হচ্ছে।
- নিম্ন আয়ের মানুষদের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার খোলাবাজারে কম দামে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করছে। ২০২২-২৩ সালে এ খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ১ হাজার ৭২০ কোটি টাকা।
- পল্লি অঞ্চলে অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২০০৮-০৯ সালে সরকার প্রকল্প চালু করে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ খাতে ১ হাজার ৮৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যার সুবিধা পাবে ৫ লক্ষ ১৮ হাজার জন।

আমাদের অঙ্গীকার

- দারিদ্র্য বিমোচন করে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো আওয়ামী লীগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত লক্ষ্যের অন্যতম। এই লক্ষ্য অর্জনে উচ্চতম প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা এবং সমাজে ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্য সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা আওয়ামী লীগের বিঘোষিত নীতি।
- দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম কৌশল হচ্ছে কৃষি ও পল্লিজীবনে গতিশীলতা। হতদরিদ্র, দুস্থ ও ছিন্নমূল মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চলমান প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী করা হবে। দেশ থেকে ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরেপনা সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা হবে।
- ২০২৮ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১১ শতাংশে, ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান এবং ২০৪১ সাল নাগাদ দারিদ্র্যের হার ৩ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ভবিষ্যতের সেবা খাতের সহায়তায় গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে শিল্প ও ডিজিটাল অর্থনীতিতে রূপান্তর করা হবে।

- আর্থিক ও ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সকলকে অর্থনীতির মূলধারায় সংযুক্ত করে সব রকমের বৈষম্য দূর করা হবে।

গ. 'আমার গ্রাম—আমার শহর' : প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সংবিধানে নগর ও গ্রামের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকীকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে অঙ্গীকার যুক্ত করেছিলেন। গ্রামকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির কেন্দ্রীয় দর্শন হিসেবে বিবেচনা করে বিগত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে বিশেষ গুরুত্বসহকারে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- প্রতিটি উপজেলায় রাস্তাঘাট উন্নত ও সম্প্রসারিত হয়েছে, যা প্রতিটি গ্রামকে উপজেলা সদরের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে এবং উপজেলার সঙ্গে জেলা সদর ও জাতীয় সড়ক যুক্ত রয়েছে।
- প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ সুনিশ্চিত হয়েছে। সুপেয় পানি এবং পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হয়েছে, যা আরও উন্নত ও সম্প্রসারণ করা হবে।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার সরকার গ্রহণ করেছে। বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকের বেতন-ভাতার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।
- উপজেলাসমূহে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল ১০০ শয্যাতে উন্নীত করা হচ্ছে। কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্যসেবাকে গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাচ্ছে।
- প্রতিটি ইউনিয়নে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সেবাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। গ্রামের তরুণসমাজ এই সেবার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। প্রত্যন্ত গ্রামের জনগণ এই সেবার মাধ্যমে দেশে-বিদেশে যোগাযোগ করছে।
- যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট সেবা সম্প্রসারণের ফলে গ্রামীণ উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থা গতিপ্রাপ্ত হয়েছে। কৃষি উপকরণ সহজলভ্য ও কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে, গ্রামীণ চাহিদা মেটানোর জন্য কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হচ্ছে। কৃষিজ ও অকৃষিজ উভয় ক্ষেত্রে কর্মকাণ্ড বহুগুণ সম্প্রসারিত হয়েছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- উন্নত রাস্তাঘাট, যোগাযোগ, সুপেয় পানি, আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ও সুচিকিৎসা, মানসম্পন্ন শিক্ষা, উন্নত পয়োনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি, কম্পিউটার ও দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসহ মানসম্পন্ন ভোগ্যপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামকে আধুনিক শহরের সকল সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা আরও উন্নত করা হবে।
- জ্বালানি সরবরাহ নির্ভরযোগ্য করার লক্ষ্যে গ্রুপ ভিত্তিতে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও সৌরশক্তি প্যানেল বসানোর উৎসাহ ও সহায়তা অব্যাহত থাকবে।

- গ্রাম পর্যায়ে কৃষিযন্ত্র সেবাকেন্দ্র, ওয়ার্কশপ স্থাপন করে যন্ত্রপাতি মেরামতসহ গ্রামীণ যান্ত্রিকায়ন সেবা সম্প্রসারণ এবং এসবের মাধ্যমে গ্রামীণ যুবক ও কৃষি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের কর্মসূচি সম্প্রসারিত করা হবে। এসব সেবার পাশাপাশি হালকা যন্ত্রপাতি তৈরি ও বাজারজাত করতে বেসরকারি খাতের প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ এবং উপকরণে বিনিয়োগ সহায়তা অব্যাহত থাকবে।
- গ্রামে অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও বিনোদনমূলক কর্মসূচি বৃদ্ধি করা হবে।
- গ্রামের যুবসমাজের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা কমাতে গ্রামেই আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তরুণদের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় উৎসাহ বাড়াতে সরকার সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

ঘ. তরুণ যুবসমাজ : 'তারুণ্যের শক্তি–বাংলাদেশের সমৃদ্ধি'

কর্মোদ্দীপ্ত তারুণ্য বাংলার অহংকার। দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুবসমাজ। উন্নত, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী বাংলাদেশ বিনির্মাণে যুবসমাজই প্রধান শক্তি। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এবং জনমিতির সুবিধা নিয়ে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন দ্রুতায়ন করার জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ 'তারুণ্যের শক্তি—বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' এ প্রতিপাদ্যকে ধারণ করেছে। এই স্লোগানের সফল বাস্তবায়নের জন্য যুবসমাজকে আত্মপ্রত্যয়ী, দক্ষ এবং ইতিবাচক মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা; তাদের সহজাত সম্ভাবনা দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনে সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করা; তাদের অর্থনৈতিক এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগে সমর্থন করা আওয়ামী লীগের মূল লক্ষ্য।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে 'জাতীয় যুবনীতি, ২০১৭' প্রণয়ন এবং 'শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং যুব বিনিময় কর্মসূচিসহ আরও অনেক কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে।
- বেকারত্বের হার ২০০৯ সালে ছিল ৬ শতাংশ। ২০২২ সালে তা ৩.৬ শতাংশে নেমে এসেছে।
- যুবসমাজকে সঠিক দিক-নির্দেশনা, কর্মোপযোগী কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করে জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ত করতে যুব উন্নয়ন পরিদপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে।
- যুবসমাজের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় যুবদের উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বীকরণ, যুবঋণ প্রদান, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি কর্মসূচি চালু হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্মোহনী নেতৃত্ব ও বিশ্বজনীন স্বীকৃতির প্রভাব যুবদের মধ্যে প্রতিফলনের লক্ষ্যে ২০২২ সাল থেকে 'শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড' প্রবর্তন করা হয়েছে।
- কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৩ কোটি ৩১ লক্ষ যুবকে ৮৩টি ট্রেডে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ৭ লক্ষ ৫৪ হাজার জন আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে।

- গত ৫ বছরে ৪ হাজার ৬৪টি যুব সংগঠন নিবন্ধন করা হয়েছে। যুবকল্যাণ তহবিল থেকে বিগত ৫ বছরে ৯৩০টি যুব সংগঠনকে ১৪ কোটি ৮১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- প্রশিক্ষিত যুবদের প্রকল্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য ঋণ কর্মসূচির আওতায় ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ১২ লক্ষ ১০ হাজার উপকারভোগীকে মূল ও ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল থেকে ২ হাজার ৫৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এ পর্যন্ত দেশের ৪৭টি জেলার ১৩৮টি উপজেলা ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় এসেছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের মধ্যে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার জন বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হয়েছে।
- তরুণদের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করার জন্য 'যুব গবেষণা কেন্দ্র' গঠন করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে যুব কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে 'জাতীয় যুব কাউন্সিল' গঠন করা হয়েছে। জাতীয় যুব কাউন্সিলের সদস্যরা দেশব্যাপী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
- নিরাপদ ও টেকসই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে দক্ষ চালক সৃষ্টির লক্ষ্যে যুবদের যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৫০০ জন দক্ষ যানবাহন চালক তৈরি করা হয়েছে।
- তথ্যপ্রযুক্তি ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লব উপযোগী দক্ষতা উন্নয়নে মোবাইল ভ্যানে তৃণমূল পর্যায়ে পশ্চাৎপদ, অনগ্রসর যুবদের কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- দেশের যুবসমাজের উন্নয়নকল্পে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকায় ৭ হাজার ৫১৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ১৬টি সংক্ষিপ্ত কোর্স ও ৩টি ডিপ্লোমা কোর্স চালু রয়েছে।
- গত ৫ বছরে বেশ কিছু আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে : 'যুব উদ্যোক্তা নীতিমালা, ২০২২'; 'যুব প্রশিক্ষণ নীতিমালা, ২০২২'; শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮; যুব উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ নির্দেশিকা, ২০২০; জাতীয় যুব কাউন্সিল বিধিমালা, ২০২১; যুব প্রশিক্ষণ নীতিমালা, ২০২২; যুব উদ্যোক্তা নীতিমালা, ২০২২; ক্রীড়া পরিদপ্তর এবং শারীরিক শিক্ষা কলেজ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২; শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড নীতিমালা, ২০২২; জাতীয় যুব পুরস্কার নীতিমালা (সংশোধিত), ২০২৩।
- অনলাইন শ্রমের বাজারে বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম (২১ শতাংশ) সেবা প্রদানকারী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ৬ লক্ষ ৫০ হাজার শিক্ষিত যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এদের অর্জিত আয় ৫ মিনিটের মধ্যে দেশে আনার জন্য 'প্রিয়পে' চালু করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ৬৬৫ মিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে তরুণসমাজের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। জনমিতিক পরিবর্তনে ২০৪১ সালে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের বয়স হবে ৩০ বছরের কম; ১৫-২৯ বছর বয়সের তরুণের সংখ্যা কমবেশি ২ কোটি। বাংলাদেশের রূপান্তর ও উন্নয়নে আওয়ামী লীগ এই তরুণ ও যুবসমাজকে সম্পৃক্ত রাখবে।

- কর্মক্ষম, যোগ্য তরুণ ও যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসার করা হবে। জেলা ও উপজেলায় ৩১ লক্ষ যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং তাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সহায়তা প্রদান কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।
- ২০৩০ সাল নাগাদ অতিরিক্ত ১ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বেকার যুবকদের সর্বশেষ হার ১০.৬ শতাংশ থেকে ২০২৮ সালের মধ্যে ৩.০ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে।
- নিরক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত তরুণ ও যুবসমাজের জন্য যথোপযুক্ত কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগীদের সহজ শর্তে ক্ষুদ্রঋণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা এবং ঋণের পরিমাণ বাড়ানো হবে।
- অনলাইন শ্রমের বাজারে বিভিন্ন পেশাদারি সেবাসমূহ যুক্ত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে হিসাবরক্ষণ, পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা, পে-রোল, আইটি সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণের কাজসহ আরও নতুন নতুন ক্ষেত্র সংযুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।
- যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ধীরে ধীরে দেশের সকল উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হবে।
- তৃণমূল পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে প্রতি উপজেলায় 'যুব প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কেন্দ্র' স্থাপন করা হবে।
- শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের বাইরে থাকা ১৭.৮ শতাংশ যুবদের অনুপাত আগামী ৫ বছরে ৭ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা হবে। আগামী ৫ বছরে ২ লক্ষ জন যুবকদের মাঝে ৭৫০ কোটি টাকা যুব ঋণ বিতরণ করা এবং ২ লাখ ৫০ হাজার জন যুবককে আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলা হবে।
- চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে দেশে-বিদেশে বিকাশমান কর্মসংস্থানের সুযোগগুলো কাজে লাগানোর জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে পলিটেকনিক ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটগুলো ঢেলে সাজানো হবে।
- যুবসমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য প্রতিটি উপজেলায় পাঠাগার স্থাপন, গণতান্ত্রিক, সাংস্কৃতিক ও শরীরচর্চা কেন্দ্র এবং 'স্মার্ট ইয়ুথ হাব' গড়ে তোলা হবে।
- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সহজ শর্তে এবং স্বল্প সুদে ঋণ দেবার জন্য বিশেষ সেল গঠন করে উদ্যোক্তাদের সহায়তা করা হবে।
- অসহায়, অসমর্থ এবং শারীরিকভাবে অক্ষম যুবদের শিক্ষা ও চিকিৎসা সহায়তার আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।
- মাদক-সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ নিরসন এবং মাদকাসক্তদের ও মাদক ব্যবসায়ীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।
- অবকাঠামোর উন্নয়ন ও পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগের মাধ্যমে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটকে 'Centre of Excellence' হিসেবে গড়ে তোলার কাজ অব্যাহত থাকবে।

ঙ. কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং জনগণের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে, শিল্পের কাঁচামাল জোগানে ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে কৃষির

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কৃষিবিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। বর্তমানে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কৃষির উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পর উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। বিগত ২০২২-২৩ সালে চালের উৎপাদন ছিল ৪ কোটি ১৫ লাখ ৬৯ হাজার মেট্রিক টন, যা সর্বকালের রেকর্ড অতিক্রম করেছে। ২০০৮-০৯ সালে যেখানে মোট খাদ্যশস্য (চাল, গম, ভুট্টা) উৎপাদন ছিল ৩ কোটি ২৮ লক্ষ ৯৬ হাজার মেট্রিক টন, সেখানে ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা বেড়ে ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ ৮৮ হাজার মেট্রিক টন হয়েছে।
- বাংলাদেশ বিশ্বে ধান উৎপাদনে তৃতীয়, সবজি ও পেঁয়াজ উৎপাদনে তৃতীয়, পাট উৎপাদনে দ্বিতীয়, চা উৎপাদনে চতুর্থ এবং আলু ও আম উৎপাদনে সপ্তম স্থানে রয়েছে।
- দেশি-বিদেশি ফল চাষেও অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। কফি, কাজুবাদাম, গোলমরিচ, মাল্টা, ড্রাগন ফলসহ অপ্রচলিত ফসলের চাষাবাদে কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে মোট ফল উৎপাদিত হয়েছে প্রায় ১ কোটি ৫০ লাখ মেট্রিক টন। ২০০৬ সালে মাথাপিছু ফল গ্রহণের হার ছিল ৫৫ গ্রাম, যা বেড়ে ২০২৩ সালে এ হয়েছে ৮৫ গ্রাম।
- বিগত ১৫ বছরে দেশে উদ্ভাবিত হয়েছে ৬৯৯টি বৈরী পরিবেশে সহনশীল, উন্নত ও উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল এবং প্রায় ৭০৮টি প্রযুক্তি।
- সার, বীজ, কীটনাশক ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ বিতরণে সুশাসন নিশ্চিত করা হয়েছে। কৃষি উপকরণের দাম কমানো হয়েছে এবং তা কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। কৃষকের উৎপাদন খরচ নিম্নপর্যায়ে রাখতে সরকার ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত সার, বিদ্যুৎ, সেচ ইত্যাদি খাতে মোট ১ লাখ ২৯ হাজার কোটি টাকার বেশি ভর্তুকি দিয়েছে।
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষিকে আধুনিকায়ন করার কাজ চলছে। কৃষিযন্ত্রের ক্রয়মূল্যের ওপর ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়া হয়, যার ফলে কৃষক কম মূল্যে যন্ত্রপাতি কিনতে পারছে। ২০১০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত কম্বাইন হারভেস্টার, রিপার, সিডার, পাওয়ার টিলারসহ প্রায় ১ লক্ষ ৩৩ হাজার কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। তিন হাজার কোটি টাকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলমান আছে।
- খাদ্যনিরাপত্তা ও পুষ্টি সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রাধিকার অপরিহার্য। বাণিজ্যিক কৃষি বিস্তারের জন্য উচ্চমূল্যের রপ্তানিমুখী ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে। অনাবাদি জমি এবং পাহাড়, হাওর, বাঁওড়, উপকূলীয় অঞ্চল ও সকল প্রতিকূল এলাকায় অনাবাদি জমিতে চাষাবাদ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।
- পানিসম্পদ ও সৌরশক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার এবং উত্তম কৃষিচর্চার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব কৃষিব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। দেশের কৃষিব্যবস্থা 'জীবন নির্বাহী' কৃষি থেকে 'বাণিজ্যিক কৃষি'তে রূপান্তরিত হচ্ছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- ‘সবার জন্য খাদ্য’ আওয়ামী লীগের মূল লক্ষ্য ও অঙ্গীকার। কৃষি, কৃষক-কৃষানি ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য প্রণীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে টেকসই উন্নয়ন কৌশল অনুসরণের ধারা অব্যাহত থাকবে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পুষ্টি চাহিদা পূরণ, সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিসম্মত খাদ্য সরবরাহ ও প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, বাণিজ্যিক কৃষির বিকাশ, কৃষিনির্ভর শিল্পের প্রসার, গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন, কৃষি ও অকৃষিজ পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং বহুমুখীকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এই কৌশলের লক্ষ্য। বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে।
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার বিবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যা আগামীতে সম্প্রসারিত হবে। কৃষিঋণ সহজলভ্য ও সহজগম্য করার লক্ষ্যে ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদে কৃষিঋণ দেওয়া অব্যাহত থাকবে; কেন্দ্রীয় ব্যাংক ০.৫ শতাংশ হারে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে পুনঃ অর্থায়ন করবে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংক কৃষিঋণ বিতরণে আরো উৎসাহিত হবে।
- দেশে ক্ষুদ্র কৃষকদের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৫৪ লক্ষ ৮১ হাজার ৩৫০ জন এবং কৃষি ক্ষুদ্র কৃষকনির্ভর। কৃষি উপকরণে বিনিয়োগের জন্য ক্ষুদ্র কৃষকদের সম্পদ অপ্রতুল। কৃষির জন্য সহায়তা ও ভর্তুকি তথা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান আওয়ামী লীগ অব্যাহত রাখবে।
- আওয়ামী লীগ সরকার ইতোমধ্যেই কৃষি উৎপাদন আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল জমি আবাদের আওতায় আনার নীতি বাস্তবায়ন করছে। কোনো জমিই অনাবাদি থাকবে না।
- কৃষিতে শ্রমিকসংকট লাঘব এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহজে ব্যবহারযোগ্য কৃষি যন্ত্রপাতি সহজলভ্য ও সহজপ্রাপ্য করা হবে। কৃষি যন্ত্রপাতিতে ভর্তুকি প্রদান অব্যাহত থাকবে।
- সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলায় গুরুত্বারোপ করা হবে।
- বাণিজ্যিক কৃষি, জৈবপ্রযুক্তি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, রোবোটিকস, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ন্যানো-টেকনোলজিসহ গ্রামীণ অকৃষিজ খাতের উন্নয়ন ও বিশ্বায়ন মোকাবিলায় উপযুক্ত কর্মকৌশল গ্রহণ করা হবে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষির আধুনিকায়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং কৃষি গবেষণার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ অব্যাহত থাকবে।
- কৃষিকাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন পণ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হবে।
- স্থানীয় পর্যায়ে বহুবিধ ব্যবহার উপযোগী কোল্ডস্টোরেজ স্থাপন ও ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ উদ্যোগ উৎসাহিত করা হবে।
- কৃষিপণ্যের দক্ষ সাপ্লাই চেইন ও ভ্যালু চেইন গড়ে তোলার সবিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং সহায়তা প্রদান অব্যাহত থাকবে।
- সফলতম ও কর্মক্ষম কৃষিবিজ্ঞানীদের চাকরির বয়সসীমা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষকের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় উপযুক্ত কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হবে। একই সঙ্গে বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট সুযোগের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করা হবে।

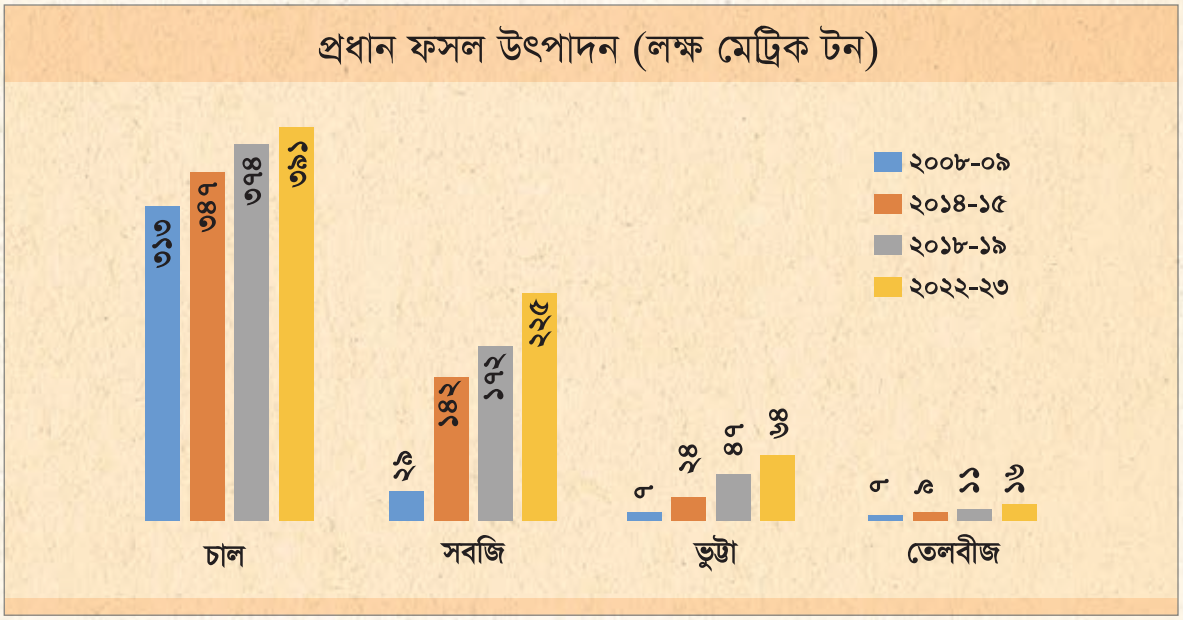

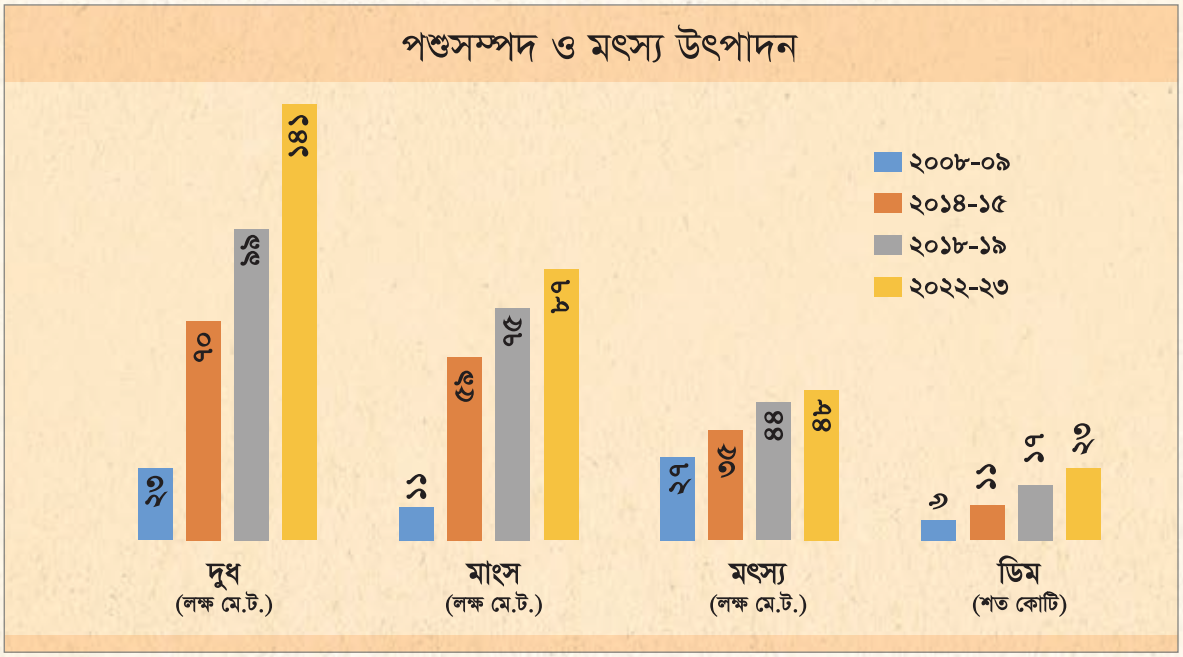

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

বাংলাদেশের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ; সর্বোপরি আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ চাহিদা পূরণে উদ্যোক্তা তৈরি, কর্মসংস্থান তৈরি ও গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখতে এ খাত অব্যাহত ভূমিকা রেখে চলেছে।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- মৎস্য খাতের অর্জন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এক অনন্য উচ্চতায়। ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাছ উৎপাদিত হয়েছে ৪৯ লক্ষ ১৫ হাজার মেট্রিক টন; যা ২০১০-১১ সালের মোট উৎপাদনের (৩০ লক্ষ ৬২ হাজার মেট্রিক টন) চেয়ে প্রায় ৬১ শতাংশ বেশি।
- জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) প্রতিবেদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয়, বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছের উৎপাদনে পঞ্চম, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টাশিয়ান্স ও ফিনফিস উৎপাদনে যথাক্রমে ৮ম ও ১১তম স্থান অর্জন করেছে, বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১ম ও তেলাপিয়া উৎপাদনে বিশ্বে ৪র্থ এবং এশিয়ার মধ্যে ৩য় স্থান অর্জন করেছে।
- বর্তমানে ৫০টির অধিক দেশে মাছ রপ্তানি হয়। সর্বশেষ ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৭৪ হাজার মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে আয় হয়েছে ৫ হাজার ১৯২ কোটি টাকা, যা গত বছরের তুলনায় ২৭ শতাংশ বেশি।
- দেশে-বিদেশে নিরাপদ মৎস্য সরবরাহের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর তিনটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি পরিচালনা করছে।
- দেশীয় মাছ সংরক্ষণের অংশ হিসেবে ৩৭ প্রজাতির দেশীয় বিলুপ্ত প্রায় মাছের প্রজনন কৌশল ও চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রথমবারের মতো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে দেশীয় মাছের লাইভ জিন ব্যাংক। জিন ব্যাংকে এখন পর্যন্ত ১০২ প্রজাতির মাছ সংরক্ষিত আছে।
- ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম প্রাণিজ আমিষের চাহিদার ভিত্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ২২ লক্ষ ৮৬ হাজার মেট্রিক টন, ১০ লক্ষ ৮৪ হাজার মেট্রিক টন এবং ৪৬৯ কোটি ৬১ লক্ষ, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে যথাক্রমে ১ কোটি ৩০ লক্ষ ৭৪ হাজার মেট্রিক টন, ৯২ লক্ষ ৬৫ হাজার মেট্রিক টন এবং ২ হাজার ৩৩৫ কোটি ৩৫ লক্ষতে উন্নীত হয়েছে। বিগত এক যুগে দুধ উৎপাদন ৪ গুণ, মাংস ৬ গুণও ডিম ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ফলে বাংলাদেশ ছাগল উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ ও ছাগল মাংস উৎপাদনে পঞ্চম স্থান অর্জন করেছে। বিগত চার-পাঁচ বছর দেশীয় গবাদিপশু কোরবানির চাহিদা মেটাচ্ছে। আমদানির প্রয়োজন হয়নি।
- প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে টিকা উৎপাদন ও প্রয়োগ বাড়ানো হয়েছে। 'শেখ হাসিনার উপহার, প্রাণীর পাশেই ডাক্তার'—এই নীতি সামনে রেখে প্রাণিচিকিৎসা সেবা খামারির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য ৩৬০টি উপজেলায় মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুনীল অর্থনীতির বিকাশ সাধনে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়নসহ সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০; সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা, ২০২২ এবং সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ প্রণীত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- ২০২৮ সালের মধ্যে গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতা ১.৫ গুণ বৃদ্ধি করা হবে।
- বাণিজ্যিক দুগ্ধ ও পোলট্রি খামার প্রতিষ্ঠা, আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে সহজ শর্তে ঋণ, প্রয়োজনীয় ভর্তুকি, প্রযুক্তিগত পরামর্শ ও নীতিগত সহায়তা প্রদান করা হবে।
- গুণগত মানসম্পন্ন পশুখাদ্য উপকরণের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তির প্রসার ও যৌক্তিক মূল্য নিশ্চিত করা হবে।
- উৎপাদিত প্রাণিজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানিমুখী শিল্পের প্রসার করা হবে।
- চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রস্তুতি হিসেবে বাণিজ্যিক খামার ম্যাকানাইজেশন ও স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা হবে।
- সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারপূর্বক খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনে টেকসই মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন ৪৯ লক্ষ ১৫ হাজার মেট্রিক টন থেকে ৫৮ লক্ষ ৪০ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত করা হবে এবং পুষ্টির চাহিদা পূরণে জনপ্রতি মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৬৭.৮০ গ্রাম/দিন থেকে বৃদ্ধি করে ৭৫ গ্রাম/দিনে উন্নীত করা হবে।
- সুনীল অর্থনীতির বিকাশ সাধনে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ ও দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ নিশ্চিত করা হবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, অভিযোজন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ডেল্টা হটস্পটভিত্তিক প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
- ভ্যালু চেইন উন্নয়নের মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, বৈচিত্র্যময় ভ্যালু অ্যাডেড মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে মৎস্য অপচয় ১০ শতাংশ হ্রাস করা হবে এবং এ খাতে আগামী ৫ বছরে প্রায় ৬ লাখ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে।
- মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে রপ্তানিমুখী মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বেসরকারি খাতকে উদ্বুদ্ধ করা হবে; দেশের বাইরে নতুন নতুন বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আমদানিকারক উদ্বুদ্ধকরণে ফিশ এক্সপো আয়োজন এবং মৎস্যপণ্য প্রক্রিয়াকরণে এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন (EEZ) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রপ্তানি আয় ৪ হাজার ৭৯০ কোটি থেকে ১৫ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করা হবে।
- প্রাণিসম্পদ-গবাদিপশুর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলমান কর্মসূচিকে বিস্তৃত করা হবে। এসব পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও মূল্য সংযোজনের লক্ষ্যে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে।
- পুকুরে মাছ চাষ এবং যেখানে সম্ভব ধানখেতে মাছ চাষের আরও প্রসারের জন্য উন্নত জাতের পোনা, খাবার, রোগব্যাধির চিকিৎসা অব্যাহত রাখা হবে।
- খামারিদের জন্য সুলভে পুঁজিসংস্থান ও বিদ্যুৎ-সংযোগসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান অব্যাহত রাখা হবে।

চ. শিল্প উন্নয়ন

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর থেকে শিল্পোৎপাদনে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। টানা তিন মেয়াদে তৈরি হয়েছে শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হবার প্রয়োজনীয় অবকাঠামোসমূহ। দেশে রয়েছে পর্যাপ্ত শিক্ষিত তরুণ এবং

অভিজ্ঞ জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশ রয়েছে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের মধ্যগগনে। আওয়ামী লীগ সরকারের পরিচালনায় সামগ্রিকভাবে দেশ প্রস্তুত হয়েছে শিল্পোন্নত দেশে উত্তীর্ণ হবার জয়যাত্রায়। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তিগত সুবিধা কাজে লাগিয়ে দেশীয় কাঁচামাল ও সম্পদ ব্যবহার করে শ্রমঘন আমদানির বিকল্প এবং রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশ এগিয়ে যাবে ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ে পরিণত হবার পথনকশা ধরে; সৃষ্টি হবে ব্যাপক কর্মসংস্থান; বাড়বে মানুষের আয়। নাগরিকদের বাড়তি আয়ের ফলে সম্প্রসারণ হবে অভ্যন্তরীণ বাজার। ব্যাপক শিল্পায়নের ফলে নতুন নতুন পণ্য যুক্ত হবে দেশের অর্থনীতিতে, যা পণ্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে বাড়াবে রপ্তানির বাজার। ধীরে ধীরে ভারী শিল্প উৎপাদনের দিকে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে চলবে বাংলাদেশ।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পোশাকশিল্পের রাজধানী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে বিশ্বময়।
- শিল্পের বিকাশে গত ১৫ বছরে ১৭টি আইন, ২০টি নীতিমালা, ২টি গাইডলাইন, ৫টি নির্দেশনা এবং ৬টি বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- টেলিভিশন, ফ্রিজ, গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, মোটরসাইকেল, হালকা যন্ত্রপাতি, মোবাইল ফোন ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক সামগ্রী দেশে উৎপাদিত হচ্ছে। আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা কমেছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে।
- জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে দশ বছর মেয়াদি 'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি মাস্টার প্ল্যান' প্রণয়ন করা হয়েছে।
- পরিবেশ সংরক্ষণের কথা বিবেচনায় নিয়ে প্রতিটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশজ উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান ছিল ২৬.৫৩ শতাংশ, যা ২০২১-২২ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৬.৯২ শতাংশে। এ সময়কালে জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান বেড়েছে ১০.৩৯ শতাংশ। ভবিষ্যতে এ খাতের অবদান আরও বৃদ্ধি করার জন্য যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ভোক্তা সাধারণের চাহিদা বিবেচনা করে নতুন ৪৩টি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যকে বিএসটিআইয়ের বাধ্যতামূলক মান সনদের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। ইউনিডোর সহায়তায় বিএসটিআইতে বিশ্বমানের ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে।
- শিল্প খাতকে পরিবেশবান্ধব করার জন্য সারা দেশে মোট ৮০টি শিল্পনগর স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে শিল্প প্লটের সংখ্যা ১২ হাজার ৩১৩টি।
- পুরান ঢাকার ঝুঁকিপূর্ণ কেমিক্যাল গোডাউন সরিয়ে টঙ্গীর কাঠালদিয়ায় এবং রাজধানীর শ্যামপুরে দুটি অস্থায়ী গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি সকল দাহ্য রাসায়নিকের গুদাম স্থায়ীভাবে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের লক্ষ্যে মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানে বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের জন্য ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, যশোর, বগুড়া ও নরসিংদী জেলায় ডেডিকেটেড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

- অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও হাজারীবাগ থেকে ট্যানারি শিল্প সাভারে পরিবেশবান্ধব চামড়াশিল্প নগরীতে স্থানান্তর এবং চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে আরও দুটি ট্যানারি পল্লি স্থাপন করা হয়েছে।
- ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মালিকানা সুরক্ষায় মোট ১৭টি পণ্য জিআই (ভৌগোলিক নির্দেশক) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।
- বিশ্বব্যাপী পরিবেশ ধ্বংসকারী পলিথিন ও প্লাস্টিক পণ্য নিষিদ্ধকরণের ফলে পরিবেশবান্ধব পাটপণ্যের চাহিদা বাড়ছে। পাটের ব্যবহার বহুমুখী করে এখন তৈরি করা হচ্ছে শাড়ি, ব্যাগ, জুতা, পর্দার কাপড়, বেড কভার, ফার্নিচার ইত্যাদি। ইতোমধ্যে সরকারের সহযোগিতায় বাংলাদেশি বিজ্ঞানীরা পাটের জন্মরহস্য উন্মোচনসহ পলিথিনের বিকল্প সোনালি ব্যাগ উদ্ভাবন করেছেন।
- পরিকল্পিত শিল্পায়নের লক্ষ্যে সরকার ১০০টি সরকারি ও বেসরকারি ইকোনমিক জোন স্থাপনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ১১টিতে শুরু হয়েছে শিল্পোৎপাদন, এগিয়ে চলছে আরও ২৮টির কাজ। অর্থনৈতিক অঞ্চলের শিল্প বিনিয়োগ থেকে ৪০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে এবং ১ কোটি শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে।
- ২০০৮-০৯ অর্থবছরে কারখানাজাত শিল্পপণ্য উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ৬.৬৯ শতাংশ, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে বেড়ে হয়েছে ১১.৪১ শতাংশ। করোনা অতিমারি শুরু হওয়ার আগের বছর, ২০১৮-১৯ সালে এ খাতের প্রবৃদ্ধি ছিল সবচেয়ে বেশি, ১২.৩৩ শতাংশ।
- ইতোমধ্যে ১০টি হাই-টেক পার্ক নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। আরও ৯২টি পার্ক নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে।
- বিগত ১৫ বছরে ইপিজেডে ৪৪৯টি শিল্প স্থাপন করা হয়েছে। বন্ধুপ্রতিম দেশ চীন, জাপান, কোরিয়া ও ভারতের জন্য ৪টি অর্থনৈতিক অঞ্চল সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- নিরবচ্ছিন্নভাবে ইউরিয়া সারের জোগান নিশ্চিত করতে বার্ষিক ১০ লাখ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা উদ্বোধন করা হয়েছে।
- প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজের মাধ্যমে পাজেরো স্পোর্ট সিআর-৪৫ সংযোজন, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এবং জাপানের হোন্ডা মোটরস কোম্পানির যৌথ বিনিয়োগে হোন্ডা ব্র্যান্ডের মোটরসাইকেল উৎপাদন ও বাজারজাত করা হচ্ছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- দেশে প্রতিবছর ২০ লাখের বেশি মানুষ শ্রমশক্তিতে নতুন করে যুক্ত হচ্ছে। শিল্প খাতের বিকাশ এবং নতুন নতুন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে এদের প্রত্যেকের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।
- কর্মসংস্থানের জন্য সবচেয়ে বেশি সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কারখানা। এ খাতের বাধাসমূহ দূর, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও বিদেশি মানবসম্পদের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে এই খাতকে আরও শক্তিশালী, সুসংগঠিত ও গতিশীল করে তোলা হবে।
- উদ্যোক্তা শ্রেণিকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার যথোপযুক্ত নীতি প্রণয়ন ও কর্মসূচি গ্রহণ করবে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারব্যবস্থা, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি, উপযুক্ত ভৌত অবকাঠামো এবং অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণ নীতিমালাসংবলিত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

- ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোম্পানি নিবন্ধন ও আইনসংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা সহজীকরণের লক্ষ্যে, কোম্পানি আইনের সংশোধন করা এবং কোম্পানিসংক্রান্ত আইনি মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করতে ভার্চুয়াল আদালতের সুবিধাসহ দেশের সকল বিভাগীয় শহর থেকে সংযোগযোগ্য বিশেষায়িত আদালতের ব্যবস্থা করা হবে।
- চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত। ২০২৪ সাল নাগাদ এ খাত থেকে ৫ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার। রপ্তানি আয় বৃদ্ধির জোরালো কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
- কর্মসংস্থান সম্প্রসারণের জন্য ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প, তাঁত ও রেশমশিল্পকে সংরক্ষণ এবং প্রতিযোগিতা সক্ষম করা হবে। বেনারসি ও জামদানিশিল্পকে উৎসাহিত করা হবে।
- পরিবেশবান্ধব বিবেচনায় বিশ্বব্যাপী পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা বাড়ছে। এই সুযোগ নেওয়ার জন্য পাটপণ্যে বৈচিত্র্য আনা হবে এবং পাটশিল্পকে লাভজনক করার উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। পাটশিল্পে বেসরকারি খাতের উদ্যোগ উৎসাহিত করা হবে।
- কামার, কুমার ও মৃৎশিল্পীদের উন্নয়নের জন্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে। এসব শিল্পের জন্য প্রয়োজন অনুসারে প্রণোদনা দেওয়া হবে।
- আইটি শিল্পের উন্নয়ন, তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল খাতে হাইভ্যালু পণ্য যুক্ত করে এ খাতের সম্প্রসারণ, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, জাহাজ নির্মাণ, ওষুধ, চামড়া, রাসায়নিক দ্রব্য; খেলনা, জুয়েলারি, আসবাবপত্রসহ জ্ঞাননির্ভর নতুন নতুন শিল্পের বিকাশকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
- প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বাস্তব রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে সেবা খাতের সমীক্ষা ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হবে।

ছ. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

উন্নত কিংবা উন্নয়নশীল প্রতিটি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যাপ্ত, নির্ভরযোগ্য ও ক্রয়ক্ষমতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ মূল্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সংস্থান একটি পূর্বশর্ত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে বিদেশি শোষণ চিরতরে বন্ধ এবং জাতীয় স্বার্থকে সুরক্ষা দিতে দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদসহ সকল প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবন্ধু হত্যার ২১ বছর পর জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের প্রথম সরকারের সময় (১৯৯৬ থেকে ২০০১) জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে যুগান্তকারী কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াতের ব্যাপক লুটপাট, অব্যবস্থাপনা এবং অদক্ষতার কারণে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ২০০৯ সাল থেকে শেখ হাসিনার সরকারের তিন মেয়াদে দেশে যুগান্তকারী ও বৈপ্লবিক উন্নয়ন করা হয়। ফলে শিল্প ও বাণিজ্য খাত প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যুৎ পাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলসহ দেশের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ প্রাপ্তি সুনিশ্চিত হয়েছে।

বিদ্যুৎ খাতে উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- একক জ্বালানি উৎসের ওপর নির্ভরতার অতীতের সরকারগুলোর ভ্রান্ত নীতি পরিহার করে শেখ হাসিনার সরকার জ্বালানি বহুমুখীকরণের নীতি গ্রহণ করেছে। মানসম্মত ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- দেশের শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে।

- মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ২২৮ কিলোওয়াট (২০০৮ সালে) থেকে বৃদ্ধি করে ৬০৯ কিলোওয়াটে উন্নীত করা হয়েছে।
- বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৮ হাজার ৫৬৬ মেগাওয়াটে উন্নীত করা হয়েছে, যেখানে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে মাত্র ৩ হাজার ২৬৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল।
- ভারতের ঝাড়খন্ড থেকে ১ হাজার ৪৯৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমাদের জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করার মাধ্যমে ভারত থেকে মোট ২ হাজার ৬৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ক্লিন এনার্জি অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা হয়েছে। বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন এবং বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- বিদ্যুৎ খাতে নিম্নলিখিত মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে :

  ক. পায়রা ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র;

  খ. রামপাল মৈত্রী সুপার থার্মাল ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র;

  গ. মাতারবাড়ী ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইন ৬ লক্ষ ২৯ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে, যা ২০০৯ সালের পূর্বে ছিল ২ লক্ষ ৬০ হাজার কিলোমিটার।
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ কার্যক্রম সফলভাবে শেষ হচ্ছে। ২০২৪ সালের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা হচ্ছে।
- বিদ্যুতের বিতরণ সিস্টেম লস সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনা হয়েছে। ২০০৯ সালের পূর্বে সিস্টেম লস ছিল ১৮.৮৫ শতাংশ।

আমাদের অঙ্গীকার

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষিণ এশিয়া ও উন্নয়নশীল বিশ্বের একমাত্র সরকারপ্রধান, যিনি জ্বালানি নিরাপত্তা বিষয়টিকে জাতীয় নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই নীতি অব্যাহতভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।
- নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।
- বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। পর্যায়ক্রমে ভাড়াভিত্তিক ও অদক্ষ বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহ বন্ধ (রিটায়ারমেন্ট) করা হবে।
- পরিচ্ছন্ন জ্বালানি থেকে দশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। নবায়নযোগ্য ও পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য গ্রিড যুগোপযোগী করা হবে।
- নেপাল ও ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানি এবং এই অঞ্চলে আন্তরাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বাণিজ্য ত্বরান্বিত করা হবে।
- সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ২৪ হাজার সার্কিট কিলোমিটারে উন্নীত করা হবে।

- পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) আওতায় সঞ্চালন লাইন নির্মাণ ও পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

জ্বালানি খাতে উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- গ্যাসের উৎপাদন ২০২২ সালের জুন মাসে দৈনিক ২ হাজার ৭৫২ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে। ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে এটি ছিল দৈনিক ১ হাজার ৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট।
- সরকার 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১' এর মাধ্যমে 'রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হিসেবে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক যৌথভাবে Integrated Power and Energy Master Plan (IPEMP)-২০২৩ প্রণয়ন করেছে।
- নতুন ৬টি গ্যাসক্ষেত্র (সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ, ভোলা নর্থ, জকিগঞ্জ ও ইলিশা) আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বৈদেশিক নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স-এর সক্ষমতা (১টি রিগ পুনর্বাসন, ৪টি নতুন রিগ ক্রয় ও অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ক্রয়) বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলসহ দেশব্যাপী গ্যাস নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য বর্তমান সরকারের সময়ে মোট ১ হাজার ৫২৩ কিলোমিটার ঘনফুট গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে।
- ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা নিরসনে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির জন্য প্রতিটি ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতার ২টি ভাসমান টার্মিনাল (FSRU) স্থাপন করা হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ FSRU যথাক্রমে কক্সবাজারের মহেশখালী ও পটুয়াখালীর পায়রায় স্থাপন, মহেশখালীতে বিদ্যমান একটি FSRU- এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং কক্সবাজারের মাতারবাড়ী এলাকায় দৈনিক ১ হাজার মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল' নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- জ্বালানি তেলের মজুত ক্ষমতা ২০০৯ সালের ৯ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৩.০৯ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হওয়ার ফলে দেশের জ্বালানি তেলের চাহিদা মেটানোর/মজুতের সময়কাল ৩০ দিন থেকে ৪০-৪৫ দিনে উন্নীত হয়েছে।
- দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ নির্বিঘ্ন করতে ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারির শিলিগুড়ি টার্মিনাল থেকে বাংলাদেশের পার্বতীপুর, দিনাজপুর পর্যন্ত ১৩১.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে।
- গভীর সমুদ্রে ভাসমান আনলোডিং ফ্যাসিলিটি Single Point Mooring (SPM) with Double Pipeline স্থাপনের মাধ্যমে আমদানি করা তেল জাহাজ থেকে সরাসরি পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাস করা হচ্ছে। SPM সিস্টেম চালুর ফলে তেল পরিবহন খাতে বছরে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।
- বর্তমানে দেশের পেট্রল এবং অকটেনের চাহিদার প্রায় সম্পূর্ণটুকুই অংশ সরকারি ও বেসরকারিভাবে স্থাপিত কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট ও Catalytic Reform Unit (CRU)-এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে।

- জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিশ্চিতকরণে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত তেল পাইপলাইন (২৪৯.৫৭ কিলোমিটার) নির্মাণ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জ্বালানি তেল জেট-এ-১ সরাসরি ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহের জন্য প্রায় ২১ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।
- তরল জ্বালানি সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ করা হচ্ছে। জানুয়ারি ২০০৯ এ লিক্যুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) মোট সরবরাহ ছিল ৪৫ হাজার মেট্রিক টন, বর্তমানে এর পরিমাণ প্রায় ৩০ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- নতুন কূপ খননের ফলে গ্যাস উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাফল্যের এই ধারাকে আরও বেগবান করা হবে।
- দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে; গ্যাস ও এলপিজির সরবরাহ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হবে। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে আরও দক্ষ করা হবে।
- জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রেখে কয়লানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতির ভিত্তিতে কয়লা ও খনিজসম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।
- বিদেশি তেল-গ্যাস উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কূপ খনন ও উন্নয়নের চুক্তিতে দেশের স্বার্থ সমুন্নত রাখা হবে।
- প্রাকৃতিক গ্যাস মজুতের পরিমাণ নির্ধারণ, নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার, উত্তোলন এবং গ্যাসের যুক্তিসংগত ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।
- জ্বালানি খাতে প্রযুক্তি, অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক বিধি সম্পর্কে দেশের সক্ষমতা বিশ্বমানে উন্নীত করা হবে।
- ইস্টার্ন রিফাইনারির জ্বালানি তেল পরিশোধন ক্ষমতা ১৫ লাখ মেট্রিক টন থেকে ৪৫ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হবে।

জ. যোগাযোগ

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে যোগাযোগ অবকাঠামোর গুরুত্ব অপরিসীম। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক উন্নয়নে দেশের অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনে নিরাপদ, মানসম্পন্ন ও উন্নয়নবান্ধব উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিগত ১৫ বছরে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে নতুন এক মাইলফলক।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

মহাসড়ক ও সেতু

- যোগাযোগ ব্যবস্থায় সরকারের সাফল্যের শীর্ষে রয়েছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণ। জাতীয় মর্যাদা ও গৌরবের প্রতীক স্বপ্নের পদ্মা সেতু গত ২৬শে জুন ২০২২ যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে। কোনো রূপ

বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াই ও দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তে বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয় সর্ববৃহৎ এই প্রকল্প। এটি একদিকে যেমন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতার প্রতীক, অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহস ও দৃঢ়তার প্রতীক।

- কর্ণফুলী নদীর তলদেশে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল' নির্মাণ আরেকটি বড় সাফল্য। ইতোমধ্যে টানেলের নির্মাণকাজ সম্পন্ন শেষে যানবাহন চলাচলের জন্য ২৮শে অক্টোবর ২০২৩ তারিখে খুলে দেওয়া হয়েছে।
- ঢাকা মহানগরী এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে পরিবেশবান্ধব ৬ সেকশন ও ১০৫ স্টেশনবিশিষ্ট প্রায় ১৩০ কিলোমিটার মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে দিয়াবাড়ি থেকে মতিঝিল সেকশন চালু করা হয়েছে। কমলাপুর রেলস্টেশন পর্যন্ত সম্প্রসারণের কাজ চলছে। প্রকল্পটি ২০৩০ সালের মধ্যে সমাপ্ত হবে।
- বিশ্বমানের যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য নেওয়া হয়েছে আরও বেশ কিছু মেগা প্রকল্প। বাস্তবায়নাধীন মেগা প্রকল্পগুলোর মধ্যে ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, ক্রস-বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট উল্লেখযোগ্য।
- নিরবচ্ছিন্ন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিগত দেড় দশকে ৫ হাজার ৬৫৯টি সেতু ও ৬ হাজার ১২২টি কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

রেলওয়ে

- বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে রেলওয়ের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে রেলপথ বিভাগকে গত ৪ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে রেল যোগাযোগ দ্রুত ও সহজীকরণের লক্ষ্যে পদ্মা সেতু দিয়ে নির্মিত রেলসংযোগ উদ্বোধন করা হয়েছে।
- দ্বিতীয় বঙ্গবন্ধু রেলসেতুর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।
- পর্যটন নগরী কক্সবাজার জেলার সঙ্গে ঢাকা থেকে সরাসরি রেলসংযোগ স্থাপিত হয়েছে এবং কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- জনগণের প্রত্যাশা পূরণ এবং সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নিমিত্ত রেলওয়ের সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৯ সাল থেকে বিভিন্ন রুটে মোট ১৪২টি নতুন ট্রেন সার্ভিস চালু করা হয়েছে এবং ৪৪টি ট্রেনের রুট বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আকাশপথ

- বিমান বাংলাদেশ ৪টি ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার, ২টি ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনার ও ৩টি ড্যাশ-৮ কিউ ৪০০ উড়োজাহাজসহ মোট ১২টি নতুন উড়োজাহাজ (২০১১-২০১৯) ক্রয় করে বিমানবহর আধুনিকায়নপূর্বক এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে।

- কক্সবাজারে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে সুপিরিয়র বিমান অবতরণে সক্ষম দৃষ্টিনন্দন বিমানবন্দর। নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে আঞ্চলিক কানেকটিভিটি বাড়ানোর লক্ষ্যে সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করা হচ্ছে।
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় টার্মিনাল), নতুন রাডার স্থাপন ও জেট ফুয়েল সরবরাহ করার জন্য পাইপলাইন নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৩য় টার্মিনাল থেকে বিমানবন্দরে বার্ষিক অতিরিক্ত ১২ মিলিয়ন যাত্রী হ্যান্ডলিং এবং ৪ মিলিয়ন টন কার্গো হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি তৈরি হয়েছে। উক্ত বিমানবন্দরে অতিরিক্ত আরও ২৬টি বোর্ডিং ব্রিজের সুবিধাসহ আন্তর্জাতিক মানের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধা বিদ্যমান থাকবে।

বন্দর ও নৌপথ

- নদীমাতৃক বাংলাদেশের নৌপথকে নিরাপদ, যাত্রীবান্ধব ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নৌবন্দরসমূহের আধুনিকায়ন, নৌপথের আধুনিকায়ন, নৌপথ সংরক্ষণ, নৌসহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন, নৌপথে নৌযান উদ্ধারকাজে উদ্ধারকারী জাহাজ সংগ্রহসহ নানাবিধ কার্যক্রম চলমান আছে।
- রাজধানীকে ঘিরে নাব্য ও প্রশস্ত নৌপথ নির্মাণ পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।
- সরকারের ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত প্রকল্প পায়রা বন্দর দেশের তৃতীয় সমুদ্রবন্দর হিসেবে চালু হয়েছে এবং এর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে।
- মাতারবাড়ী পোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় দেশের একমাত্র গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মোংলা বন্দর ভালোভাবে সচল করার জন্য মোংলা-ঘাসিয়াখালী চ্যানেল পুনরায় ড্রেজিং করা হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রীর যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে পাবনা, বরিশাল, রংপুর ও সিলেটে নির্মাণ করা হয়েছে ৪টি নতুন মেরিন একাডেমি। এসব মেরিন একাডেমির শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- উন্নয়নের ধারা গতিশীল করার লক্ষ্যে সুনির্মিত ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত পরিবহণ অবকাঠামো গড়ে তোলার কাজ অব্যাহত থাকবে।
- ২০৪১ সাল নাগাদ ১২টি এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করা হবে। এক্সপ্রেসওয়েগুলো হচ্ছে : ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-চট্টগ্রাম (এলিভেটেড), ঢাকা-ময়মনসিংহ, ঢাকা আউটার রিং রোড, ঢাকা-বগুড়া, মিরসরাই-কক্সবাজার, ময়মনসিংহ-বগুড়া, গাবতলী-পাটুরিয়া-কাজিরহাট, ফেনী-বরিশাল, পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া, ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-দাশুরিয়া। বর্তমানে দেশে একটি এক্সপ্রেসওয়ে রয়েছে (ঢাকা-ভাঙ্গা)।
- জাতীয় মহাসড়ক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সকল মহাসড়ককে চার লেন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- এমআরটি-১ (বিমানবন্দর-কমলাপুর ও নতুন বাজার-পূর্বাচল ডিপো), এমআরটি-২ (গাবতলী-কাঁচপুর সেতু), এমআরটি-৪ (কমলাপুর-নারায়ণগঞ্জ) ও এমআরটি-৫ (সাভার-ভাটারা) নির্মাণ ২০৩০ সালের মধ্যে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে এবং এক্সপ্রেস রেলওয়ে নির্মাণ সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

- ভারতের সঙ্গে সংযোগ পুনঃস্থাপনের জন্য চিলাহাটি থেকে বর্ডার পর্যন্ত রেললাইন নির্মিত হচ্ছে।
- ছোট-বড় নদী খনন অব্যাহত থাকবে, নদীগুলোতে পরিচ্ছন্নতা এবং সারা বছর নাব্যতা নিশ্চিত করে সারা দেশে অতীতের নৌযোগাযোগ ব্যবস্থাগুলো আধুনিকায়ন করা হবে। এতে পরিবহন খরচ কমে আসবে।
- ঢাকার চারদিকের নদীগুলোর নাব্যতা নিশ্চিত করে চক্রাকারে নৌযোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এতে গণপরিবহনের সঙ্গে সঙ্গে পণ্য পরিবহন খরচ অনেক কমে যাবে।
- আঞ্চলিক বাণিজ্য সহজ ও সম্প্রসারণের জন্য স্থলবন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।
- প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে মানসম্পন্ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর গড়ে তোলা এবং নতুন বিমানবন্দর নির্মাণ করা হবে। রাজশাহী, সিলেট, চট্টগ্রাম, বরিশাল বিমানবন্দরকে আরও উন্নত করা হবে।
- বাগেরহাট খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ অগ্রাধিকারসহ বিবেচনা করা হবে।
- বাংলাদেশ বিমানে সর্বাধুনিক বিমান যুক্ত করা হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানটিকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।
- সড়ক নিরাপদ করার জন্য একটি সড়ক নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ঝ. অবকাঠামো উন্নয়নে বৃহৎ প্রকল্প (মেগা প্রজেক্ট)

সুউচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বৃহৎ প্রকল্পের (মেগা প্রজেক্ট) গুরুত্ব অনেক। বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, বন্দরসহ অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব। সে লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার তিন মেয়াদে অনেকগুলো বৃহৎ প্রকল্প (মেগা প্রজেক্ট) গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। আশা করা যায়, জাতির অহংকার ও গর্বের প্রতীক পদ্মা সেতুসহ এই সকল প্রকল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে আশানুরূপ গতি সঞ্চার করবে।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- ২০২২ সালের ২৫শে জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত দেশের সর্ববৃহৎ সেতু পদ্মা বহুমুখী সেতু উদ্বোধন করেন। পদ্মা সেতুর ফলে সারাদেশে অবাধ যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে একটি নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও সমন্বিত ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এটি হবে Transnational Asian Highway Network-এর অংশ, যা দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা করবে।
- ২০২৩ সালের ১০ অক্টোবর পদ্মা বহুমুখী সেতুর সঙ্গে সংযুক্ত রেলওয়ে উদ্বোধন করার ফলে ঢাকার সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের অনেকগুলো জেলা রেল সংযোগের আওতায় এসেছে।
- মেট্রোরেল স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের একটি ধাপ। এর ফলে ঢাকা নগরীর অসহনীয় যানজট থেকে নগরবাসী মুক্তি পাওয়ার পাশাপাশি রাজধানীর বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণের মাত্রা কমে আসবে। যোগাযোগব্যবস্থা সহজতর হওয়ায় অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে, মেট্রোরেল মানুষের কর্মঘণ্টা সাশ্রয় করবে।

- চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে ৩.৩২ কিলোমিটার টানেল নির্মাণের ফলে চট্টগ্রামের পতেঙ্গার সঙ্গে আনোয়ারাকে সংযুক্ত করে বন্দরনগরী চট্টগ্রামকে 'One City, Two Towns' মডেলে গড়ে তোলা হয়েছে।
- ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে আকাশপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।
- ২০২৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাওলা-ফার্মগেট অংশের উদ্বোধন করার মাধ্যমে বাংলাদেশ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের জগতে প্রবেশ করেছে।
- ২০২৩ সালের ১১ নভেম্বর মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের চ্যানেলের উদ্বোধন ও প্রথম টার্মিনালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এই বন্দর চালু হলে একই সঙ্গে কনটেইনার ও পণ্যবাহী জাহাজ বন্দরে ভিড়তে পারবে।
- ২০২৩ সালের ১১ নভেম্বর বহুল প্রতীক্ষিত ১০২ কিলোমিটার দীর্ঘ চট্টগ্রামের দোহাজারী থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত রেললাইন উদ্বোধন করা হয়েছে। এ রেলপথ চালু হওয়ায় মিয়ানমার, চীনসহ ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ের করিডরে যুক্ত হবে বাংলাদেশ এবং কক্সবাজার একটি স্মার্ট সিটিতে পরিণত হবে।
- ২০২১ সালের ১০ অক্টোবর এবং ২০২২ সালের ১৮ অক্টোবর যথাক্রমে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ও দ্বিতীয় ইউনিটের পারমাণবিক চুল্লিপাত্র বা রিঅ্যাক্টর প্রেশার ভেসেল স্থাপনের কাজ উদ্বোধন করা হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ৩৩তম রাষ্ট্র হিসেবে পারমাণবিক ক্লাবের সদস্য হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।
- বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর যৌথভাবে রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র উদ্বোধন করেন। এ বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন সক্ষমতা ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট।
- ২০১৮ সালের আগস্টে দেশে প্রথম এলএনজি টার্মিনাল থেকে গ্যাস রূপান্তর করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করার কাজ শুরু হয়। এরপর ২০১৯ সালের এপ্রিলে দ্বিতীয় এলএনজি টার্মিনাল যাত্রা শুরু করে। কক্সবাজারের মহেশখালীর এলএনজি ফ্লোটিং স্টোরেজের প্রতিটি টার্মিনালের দৈনিক উৎপাদন (রিগ্যাসিফিকেশন) সক্ষমতা ৫০ কোটি ঘনফুট।
- পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় আন্ধারমানিক নদীর উপকণ্ঠে রাবনাবাদ চ্যানেল বরাবর গড়ে উঠেছে দেশের তৃতীয় বন্দর পায়রা সমুদ্রবন্দর। অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিতের ফলে ২০১৬ সালের ১৩ আগস্ট বন্দরটিতে প্রথমবারের মতো কনটেইনার জাহাজ নোঙর করতে শুরু করে।

আমাদের অঙ্গীকার

- সাশ্রয়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বিবেচনায় কিছুসংখ্যক ব্যয়বহুল প্রকল্প স্থগিত করা হয়েছে, যা যথাসময়ে পুনর্বিবেচনা করে যুক্তিসংগত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে। অর্থনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নতুন প্রকল্প বিবেচনা ও গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।

ঞ. সুনীল অর্থনীতি

বিশ্ব অর্থনীতিতে সমুদ্র অর্থনীতি প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বহুবিধভাবে অবদান রেখে চলেছে। বিশ্ববাণিজ্যের ৯০ ভাগই সম্পন্ন হয় সামুদ্রিক পরিবহনের মাধ্যমে। বিশ্ব অর্থনীতিতে বছরব্যাপী ৩ থেকে ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের

কর্মকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে সমুদ্রকে ঘিরে। সমুদ্রের গুরুত্ব এবং বঙ্গোপসাগরের বহুমাত্রিক সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'দ্য টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট, ১৯৭৪' প্রণয়ন করেন। এই গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়েই আওয়ামী লীগ ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল ফর দ্য ল অব দ্য সি (International Tribunal for the Law of the Sea-ITLOS)-এর রায়ে ২০১১ সালে মিয়ানমারের সঙ্গে বিরোধ নিষ্পত্তি এবং আন্তর্জাতিক সালিসি আদালতের রায়ে ২০১৪ সালে ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট সমুদ্রসীমা ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার।
- গত দেড় দশকে আওয়ামী লীগ সরকার দেশের সার্বিক উন্নয়নে 'সুনীল অর্থনীতি'কে সম্ভাবনার নতুন ক্ষেত্র হিসেবে অগ্রাধিকার দিয়েছে। সমুদ্রসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার সুনিশ্চিত করা, সামুদ্রিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, আহরণ ও সদ্ব্যবহার এবং অর্থনীতিতে এর অবদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'সুনীল অর্থনীতি উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা' প্রস্তুত করা হয়েছে।
- পায়রা বন্দরের নাব্যতা রক্ষার জন্য নিজস্ব অর্থায়নে ক্যাপিটাল ড্রেজিং সম্পন্ন করা হয়েছে। জাহাজ ভেড়ানোর জন্য মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরে জেটি সম্প্রসারণের বাস্তবায়ন কাজ চলমান থাকবে।
- সব নদী ও সমুদ্রবন্দরে মেনটেইন্যান্স ড্রেজিং অব্যাহত থাকবে।
- আওয়ামী লীগ সরকার সমুদ্র গবেষণা ও মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য কক্সবাজারে বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় এবং চারটি মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছে।
- সাগর থেকে মৎস্য আহরণের নিমিত্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলে মৎস্য এবং সামুদ্রিক প্রাণী আহরণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপসহ নানামুখী পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করেছে; যার সুফল বাংলাদেশের মানুষ পাচ্ছে।
- বাণিজ্যিক জাহাজের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। সরকার কোস্টাল ট্যুরিজমে গুরুত্ব আরোপ করায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সফলভাবে বাংলাদেশের জাহাজ কোস্টাল ট্যুরিজম পরিচালনায় অংশগ্রহণ করছে এবং জাহাজের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২২ লক্ষ ৩৩ হাজার মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে, যা এযাবৎকালের সর্বোচ্চ। এর ফলে দেশ লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- লবণ চাষে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার করে লবণ বিদেশেও রপ্তানি করার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।
- গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ ও সমুদ্রবন্দরসমূহে সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে এগুলোকে আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হিসেবে গড়ে তোলা হবে।
- রপ্তানি আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে বড় জাহাজ তৈরির সক্ষমতা অর্জনের জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে। এ ক্ষেত্রে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় পরিবেশ দূষণ রোধে পর্যাপ্ত গবেষণা ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার আরও সম্প্রসারণ করা হবে।

- কক্সবাজারের খুরুশকুলে ৬০ মেগাওয়াট বায়ুবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া সমুদ্রের ঢেউ এবং জোয়ার-ভাটাকে ব্যবহার করেও বিদ্যুৎ ও শক্তি উৎপাদনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- বঙ্গোপসাগরে ভারী খনিজের (হেভি মিনারেল) সন্ধান পাওয়া গেছে। সমুদ্র উপকূলীয় খনিজ বালি ও মূল্যবান ধাতু অনুসন্ধান এবং উত্তোলনে গবেষণা কার্যক্রমও জোরদার করা হবে।
- সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে পর্যাপ্ত বিনোদন ও মনোরম পরিবেশের ব্যবস্থা করে তা কীভাবে সম্প্রসারণ করা যায়, তা নিয়ে প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হবে। দেশি ও বিদেশি পর্যটক আকর্ষণের লক্ষ্যে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।
- বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় বাণিজ্যিক সম্ভাবনাময় সমুদ্র উদ্ভিদ প্রজাতি রয়েছে, যা সুনীল অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। সামুদ্রিক মৎস্য ও অন্যান্য প্রাণিজ সম্পদ চাষ ও আহরণের মাধ্যমে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য নিরসন করা হবে।
- জাহাজশিল্পের উন্নয়ন, মৎস্যসহ অন্যান্য সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং পর্যটন সেবার উৎকর্ষ সাধনের জন্য উপকূলীয় ও দ্বীপাঞ্চলের জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন অব্যাহত রাখা হবে।
- সাগর থেকে তেল-গ্যাস উত্তোলন, গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনার জন্য গবেষণা-জাহাজ সংগ্রহ করা হবে।

ট. এমডিজি অর্জন এবং এসডিজি (টেকসই উন্নয়ন) বাস্তবায়ন কৌশল (২০১৬-৩০)

বাংলাদেশ এমডিজি (সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য) অর্জনের ক্ষেত্রে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে অগ্রদূত হিসেবে আবির্ভূত হয়। বিশেষ করে দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে জেন্ডার সমতা, শিশু ও পাঁচ বছর বয়সের নিচে শিশুদের মৃত্যুহার কমানো, মাতৃমৃত্যুহার কমানো, টিকা গ্রহণের পরিধি বাড়ানো ও সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব কমানোর ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। এমডিজির ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩টি দেশের প্রতিনিধিসহ ১৩৬ দেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অনুমোদন করেন। বাংলাদেশ শুরু থেকেই এসডিজি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়ায় নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

এসডিজি শুরুর সময়কাল ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময়কাল একই হওয়ায় এসডিজির অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাগুলোকে বাংলাদেশ সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন দলিলের লক্ষ্য ও সূচকগুলোতে সমন্বিত করা হয়। পরবর্তী সময়ে ধারাবাহিকভাবে সরকার এসডিজি বাস্তবায়ন ও তদারকির জন্য এসডিজি বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা কমিটি গঠন, মুখ্য সমন্বয়ক এসডিজি পদ সৃষ্টি, হোল অব সোসাইটি অ্যাপ্রোচ গ্রহণসহ অন্যান্য পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়নে প্রথম সাত বছরে (২০১৬-২০২২) উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে। এই প্রেক্ষাপটে ২০১৬-২০ সালের পাঁচ বছরে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি অর্জন করায় জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় ও সমর্থনে সৃষ্ট 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশনস্ নেটওয়ার্ক' কর্তৃক ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে **'এসডিজি প্রগ্রেস অ্যাওয়ার্ড'** প্রদান করা হয়।

কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যেও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে ভালো করেছে বাংলাদেশ। ২০২৩ সালে ১৬৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০১তম। প্রখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক জেফরি স্যাকসের নেতৃত্বে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশনস্ নেটওয়ার্কের (এসডিএসএন) স্বাধীন মূল্যায়নে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এই মূল্যায়নে দেখা যায়, এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ধারাবাহিক অগ্রগতি অর্জন করেছে।

মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুটি অভীষ্ট (গুণগত শিক্ষা এবং পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন) অর্জনে সঠিক পথে আছে দেশ। এ ছাড়া ছয়টিতে (দারিদ্র্য বিলোপ, ক্ষুধা মুক্তি, সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি এবং শিল্প উদ্ভাবন ও অবকাঠামো) পরিমিত রূপে উন্নতি করেছে। পাঁচটি অভীষ্ট অর্জনে (জেন্ডার সমতা, শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, টেকসই নগর ও জনপদ, জলবায়ু কার্যক্রম এবং অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারত্ব) অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে। অর্থাৎ এগুলোতে উন্নয়ন ঘটানোর সুযোগ রয়েছে।

আমাদের অঙ্গীকার

যেসব অভীষ্টে বেশি নজর দিতে হবে সেগুলো হলো শোভন কাজ সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জলজ জীবন রক্ষা এবং শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান তৈরি। বাংলাদেশের সামনে যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সেটি হলো ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদা থেকে উত্তরণের ফলে বাণিজ্য সুবিধায় যে অভিঘাত আসবে, সেটি মোকাবিলা করা। বাংলাদেশকে আরও বেশি উদ্ভাবনী সৃজনশীলতা ও কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে, বিশেষত জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন, বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি, দুর্নীতিমুক্ত সেবা ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা বৃদ্ধি, উচ্চমূল্য রপ্তানি পণ্য সৃষ্টি, রপ্তানি বৈচিত্র্যায়ণ।

ঠ. ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০

ডেল্টা প্ল্যান তথা ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ মূলত একটি অভিযোজনভিত্তিক কারিগরি ও অর্থনৈতিক মহাপরিকল্পনা, যা উন্নয়নের ফলাফলের ওপর পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবহার, প্রতিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বিবেচনা করে করা হয়েছে। ইউরোপের দেশ নেদারল্যান্ডসের পরামর্শ ও সহযোগিতায় বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে এ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার রূপকল্প হচ্ছে নিরাপদ, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিঘাতসহিষ্ণু সমৃদ্ধশালী ব-দ্বীপ গড়ে তোলা। মহাপরিকল্পনার মিশন হচ্ছে দৃঢ়, সমন্বিত ও সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল কার্যকরী কৌশল অবলম্বন এবং পানি ব্যবস্থাপনা ন্যায়সংগত করা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত এবং অন্যান্য ব-দ্বীপসংক্রান্ত সমস্যা মোকাবিলা করে দীর্ঘমেয়াদি পানি ও খাদ্যনিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা।

জাতীয় উন্নয়নের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০-এর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে : ১. ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ; ২. ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন এবং ৩. ২০৪০ সাল নাগাদ একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হচ্ছে ৬টি। এগুলো হলো : ১. বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন-সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; ২. পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা ও নিরাপদ পানি নিশ্চিত করা; ৩. সমন্বিত ও টেকসই নদী অঞ্চল এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা; ৪. জলবায়ু ও বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং সেগুলোর যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা; ৫. অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় পানিসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও সুশাসন গড়ে তোলা এবং ৬. ভূমি ও পানিসম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৩.৪ সামাজিক নিরাপত্তা ও সেবা

ক. সর্বজনীন পেনশন

সর্বজনীন পেনশন হলো আওয়ামী লীগ সরকার প্রবর্তিত একটি জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ। একজন ব্যক্তির বয়স ও অবদানের হিসাবের ওপর নির্ভর করে অবসরকালীন সুবিধার তারতম্য হয়ে থাকে। মাসিক পেনশন বাবদ প্রাপ্য অর্থ আয়করমুক্ত থাকবে। ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন প্রণীত হয় এবং ২০২৩ সালের ১৭ আগস্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার উদ্বোধন করেন।

দেশের আট কোটির বেশি মানুষ এই ব্যবস্থার আওতায় আসবেন। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত শুধু সরকারি, আধা সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অবসরের পর পেনশন সুবিধা পেয়ে থাকেন। কিন্তু দেশের সব কর্মক্ষম মানুষকে পেনশন সুবিধার আওতায় আনতে নতুন এই আইন প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশ সরকার। সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান, বেকারত্ব, ব্যাধি, পঙ্গুত্ব বা বার্ধক্যের কারণে নাগরিকদের সরকারি সাহায্য দেওয়া, বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে একটি টেকসই নিরাপত্তা বলয়ে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে এই সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে।

সমাজের সব অংশের মানুষ যাতে সর্বজনীন পেনশন সুবিধা পায়, সে জন্য রয়েছে ৪টি স্কিম : ১. প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য 'প্রবাস'; ২. ব্যক্তিমালিকানাধীন/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য 'প্রগতি'; ৩. স্বকর্মে নিয়োজিত নাগরিকদের জন্য 'সুরক্ষা' এবং ৪. স্বকর্মে নিয়োজিত অতি দরিদ্রদের জন্য 'সমতা'।

বাংলাদেশে মানুষের গড় আয়ু এখন ৭৩ বছর। ২০৩১ সালের মধ্যে দেশে দুই কোটির বেশি মানুষের বয়স হবে ৬০ এর ওপরে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৬৫ বছরের ওপরে দরিদ্র বয়স্কদের ৫০০ টাকা করে মাসিক ভাতা দেয় সরকার। তবে ৬৫ বছরের ওপরে ৪০ শতাংশের বেশি মানুষ কোনো ধরনের পেনশন ও বয়স্ক ভাতা—কিছুই পান না। ব্যতিক্রমী উদ্যোগ সর্বজনীন পেনশন গ্রহণের মাধ্যমে ভবিষ্যতে জনগণের মধ্যে একধরনের নিরাপত্তাবোধ জন্ম নেবে। আজ বয়স্ক মানুষেরা যেভাবে তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবেন, সেই ভাবনা তাঁদের মধ্যে আর থাকবে না।

খ. শিক্ষা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, শিক্ষায় বিনিয়োগই শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। তাঁর নির্দেশনায় ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে স্বাধীন দেশের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই নীতি অনুসরণ করে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিজ্ঞানে সমৃদ্ধ দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। ফলে ২০০৯-২০২৩ সময়কালে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও যুগান্তকারী উন্নয়ন হয়েছে।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত দেশপ্রেমিক, উৎপাদনমুখী ও বৈশ্বিক নাগরিক গড়ে তুলতে জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আলোকে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- ২০১৩ সালে ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং প্রায় ১ লক্ষ ৪ হাজার শিক্ষকের চাকরি সরকারীকরণের মাধ্যমে এক অনন্য নজির স্থাপন করা হয়।
- ২০২৩ সাল নাগাদ প্রায় ৫ হাজার ১০০ বেসরকারি স্কুল-কলেজ এমপিওভুক্ত করা হয়েছে, যার সুফল ভোগ করছেন প্রায় ৯৮ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী।

- বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১ হাজার ৪৯৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে।
- ২০০৯ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ২ লক্ষ ৭৩৭ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।
- প্রাথমিক শিক্ষায় 'ঝরে পড়ার হার' ২০০৮ সালে ছিল ৫০ শতাংশ, তা ২০২২ সালে ১৪ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের নিট ভর্তির (এনরোলমেন্ট) হার প্রায় শতভাগ।
- ২০২৩ সালে সাক্ষরতার হার ৭৬.৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।
- 'বই উৎসব' উদ্‌যাপনের মাধ্যমে বছরের প্রথম দিনে ১০ম শ্রেণি বা সমমান পর্যন্ত বিনা মূল্যে নতুন পাঠ্যবই বিতরণেও বাংলাদেশ এখন বিশ্বের রোল মডেল। বই বিতরণের ফলে ভর্তির হার বেড়েছে এবং ঝরে পড়া কমে আসছে।
- ২০১০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল (ভোকেশনাল), এসএসসি (ভোকেশনাল) ও কারিগরি স্তরের শিক্ষার্থীর মাঝে ২৬০ কোটির বেশি কপি পাঠ্যপুস্তক বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- ২০২২ শিক্ষাবর্ষে পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের মাঝে ২ লক্ষ ১৩ হাজার ২৮৮ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্রেইল বই বিনা মূল্যে দেওয়া হয়েছে।
- শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের তাৎপর্যপূর্ণ অর্জন জেন্ডার সমতা। ছাত্রী ভর্তির হার ২০২১ সালে মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ-১০ম) স্তরে ছিল ৫৪.৬৭ শতাংশ এবং উচ্চ মাধ্যমিক (কলেজ) স্তরে ৫২.১৩ শতাংশ, যা নারী শিক্ষার প্রসারে বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার সার্থক প্রতিফলন এবং সারা বিশ্বে প্রশংসিত।
- ২০১৫ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রতিটি উপজেলায় কমপক্ষে ১টি স্কুল ও ১টি কলেজ সরকারীকরণের ঘোষণা দেন। ২০২৩ সাল নাগাদ ৬৭৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬৬৩টি কলেজ সরকারীকরণ হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের পুষ্টি নিশ্চিতের জন্য দেশব্যাপী 'মিড-ডে মিল' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ শুরুর আগে সারা দেশে ৭ হাজার প্রতিষ্ঠানে 'মিড-ডে মিল' কর্মসূচি চালু ছিল।
- সরকারি স্কুল-কলেজ ও টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠানে ২০০৯ সালের তুলনায় মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬৫ হাজার ১২৬ জন (বৃদ্ধির হার ৩০.৫১ শতাংশ) ও কলেজ পর্যায়ে ৫৬ হাজার ৭১৬ জন (বৃদ্ধির হার ৬৫.৭৩ শতাংশ) শিক্ষক নিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এই প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হওয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার প্রসারে উৎসাহ দিয়েছেন। বর্তমানে দেশে ৫৬টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও ১১৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।
- কর্মমুখী, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় গুরুত্বারোপ করে প্রতি উপজেলায় আন্তর্জাতিক মানের একটি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।
- সরকার ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ২৩টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, নতুন ২টি সার্ভে ইনস্টিটিউট স্থাপন করেছে এবং অন্য ২টি সার্ভে ইনস্টিটিউট সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রমকে যুগোপযোগী এবং কর্মমুখী শিক্ষায় রূপান্তরের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাকে স্বীকৃতি দিয়ে স্নাতকোত্তর মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।
- ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে শিক্ষানীতির লক্ষ্য বর্ণিত হয়েছে যে 'রাষ্ট্র ক. একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য, খ. সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিকের জন্য, গ. আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।' আওয়ামী লীগ সরকার নিষ্ঠার সঙ্গে এই নীতি অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করবে।
- শিক্ষার বিকাশ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে, সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসনে গতিবেগ সঞ্চার করে। এই বিশ্বাস থেকে আওয়ামী লীগ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ যুক্তিসংগত করবে এবং তার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করবে।
- বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন সহায়তা (এমপিওভুক্তি) কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নারী শিক্ষকের অনুপাত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকবে।
- স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভাষা, উচ্চতর গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষাকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হবে। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ল্যাবরেটরি গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে। মেধাবী বিজ্ঞান ও গণিতের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হবে।
- মাদ্রাসা ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গিবাদী ধ্যানধারণা প্রচার ও জঙ্গিবাহিনী গড়ে তোলার ষড়যন্ত্রমূলক প্রয়াস কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা হচ্ছে।
- মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করতে যথাযথ শিক্ষা পাঠক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হাতে নেওয়া হয়েছে।
- নারী শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সংগতি রেখে উপবৃত্তি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। দরিদ্র ও দুর্বলতর জনগোষ্ঠীর সন্তানদের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ আরও প্রসারিত হবে।
- শিক্ষকদের বেতন, মর্যাদা বৃদ্ধিসহ নানা কল্যাণমুখী ও যুগোপযোগী উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন গ্রেড ও মর্যাদা বৃদ্ধির কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণক্রমে এর সিংহভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে। এই বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করা হবে।
- শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের একমাত্র মানদণ্ড হবে মেধা, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা।

গ. স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার কল্যাণ

সর্বজনীন স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা নিশ্চিত করা আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। রূপকল্প-২০২১-এর ধারাবাহিকতায় রূপকল্প-২০৪১-এর কর্মসূচিতে মৌলিক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা উন্নত ও সম্প্রসারিত হবে।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- কোভিড অতিমারি প্রতিরোধে সরকারের সাফল্য বিশ্বে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে। টিকা আবিষ্কারের পর থেকে অদ্যাবধি ৩৭ কোটি ডোজ টিকা বিনা মূল্যে প্রদান করা হয়েছে।
- সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সংখ্যা ২০০৬ সালে ছিল ১৪টি এবং সাধারণ শয্যাসংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার ৫৭৯টি। বর্তমানে হাসপাতালের সংখ্যা ৩৭টি এবং সাধারণ শয্যা সংখ্যা উন্নীত হয়েছে ৭১ হাজারে। চিকিৎসকদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য ২০০৬ সালে বাংলাদেশে মাত্র একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, বর্তমানে হয়েছে ৫টি।
- বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ২০০৬ সালে ছিল ২৬টি, যা বর্তমানে ৩ গুণ বেড়ে ৭৩টি হয়েছে। সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৬টি। ডেন্টাল কলেজ ও ইউনিট ৩টি থেকে ১০টি হয়েছে। বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ ২৭টি হয়েছে।
- মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলস (ম্যাটস) ২০০৬ সালে ছিল ৭টি, বর্তমানে ১৩টি। আইএইচটি (ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি) ২০০৬ সালে ছিল ৩টি, বর্তমানে ১৪টি।
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৪২টি জেলা হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা ১০০ থেকে ২৫০ শয্যায় এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোরগোড়ায় নেওয়ার জন্য ১৭ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। বিএনপি-জামায়াত আমলে রাজনৈতিক হিংসার বশবর্তী হয়ে প্রায় ১০ হাজারের বেশি ক্লিনিক বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত।
- বিগত দেড় দশকে বাংলাদেশে ডাক্তারের সংখ্যা ১০ হাজার ৩৩৮ জন থেকে প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ হাজার ১৭৩ জনে উন্নীত হয়েছে। নার্স ও নন-মেডিকেল কর্মচারীদের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণের বেশি।
- সরকারি নার্স ২০০৬ সালে ছিল ১৩ হাজার ৬০২ জন, যা ২০২৩ সালে সোয়া ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪৪ হাজার ৩৫৭ জন।
- মেডিকেল টেকনোলজিস্টের সংখ্যা ২০০৬ সালের ১ হাজার ৮৮৮ জন থেকে ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩ সালে দাঁড়িয়েছে ৬ হাজার ২৬৪ জনে।
- স্বাস্থ্য খাতে আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সেবা সহজলভ্য হয়েছে। ন্যাশনাল কল সেন্টার জাতীয় স্বাস্থ্য বাতায়নের মাধ্যমে বর্তমানে ২৪৪টি টেলিমেডিসিন সেন্টার চালু আছে, যার কোনোটিই আগে ছিল না।
- বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ৭২.৪ বছর, যা ২০০৬ সালে ছিল মাত্র ৫৯ বছর।
- শিশুমৃত্যুর হার ২০০৬ সালের তুলনায় চার গুণের বেশি কমে প্রতি হাজারে ২১ জনে নেমে এসেছে। নবজাতকের মৃত্যুহার কমেছে দ্বিগুণের বেশি। মাতৃমৃত্যুর হার ২০০৬ সালের তুলনায় দ্বিগুণের বেশি হ্রাস পেয়ে প্রতি এক লাখে ১৫৬ জনে নেমে এসেছে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রবাসী বাঙালি বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় কোভিড টিকা আবিষ্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

- ইপিআই (সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি) টিকা প্রদানের হার ২০০৬ সালে ছিল মাত্র ৭৫ শতাংশ, যা বর্তমান সরকারে সময়কালে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।
- রাতকানা রোগ প্রতিরোধ এবং শিশুর সঠিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশের উদ্দেশ্যে ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী ৯৮.৭ শতাংশ শিশুকে জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন প্রোগ্রামের আওতায় আনা হয়েছে।
- ২০০৬ সালের তুলনায় শিশুস্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। ৫ বছরের কম বয়সী খর্বকায় শিশুর সংখ্যা প্রায় অর্ধেক কমে ২৪ শতাংশে এবং কৃশকায় শিশুর সংখ্যা হ্রাস পেয়ে মাত্র ১১ শতাংশে নেমে এসেছে। স্বল্প ওজনের শিশুর সংখ্যা ২২ শতাংশ, যা পূর্বের তুলনায় প্রায় অর্ধেক কমেছে।
- দেশে তৈরি ওষুধ ৯৮ শতাংশ চাহিদা মেটাচ্ছে। ওষুধশিল্পের রপ্তানি আয় ৬০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার, যা ২০০৬ সালের তুলনায় ২২ গুণ বেশি।
- ২০০৬ সালে সরকারি নার্সিং কলেজ ছিল ৫টি, বর্তমানে তা ৬৯টিতে উন্নীত হয়েছে; আরও ১১টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে বেসরকারি নার্সিং কলেজের সংখ্যা ৩৫০টিতে উন্নীত হয়েছে।
- পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির আওতায় গর্ভনিরোধক বিস্তারের হার বর্তমানে ৬৪ শতাংশ, যা ২০০৬ সালে ছিল মাত্র ৪৮ শতাংশ; ৭০ শতাংশ প্রসব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অ্যাটেনডেন্টের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।
- কালাজ্বর নির্মূলে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক বাংলাদেশ স্বীকৃতি পেয়েছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য দেশের প্রত্যেক মানুষের কাছে একটি ইউনিক হেলথ আইডি প্রদান এবং হাসপাতাল অটোমেশন ব্যবস্থাপনা চালু করা হবে।
- সকল নাগরিককে একই রকম স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালু করা এবং আন্তর্জাতিক মানের সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল স্থাপন করা হবে।
- স্বাস্থ্য বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি পাবলিক হেলথ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।
- স্বাস্থ্য ব্যয় সহজ করার জন্য স্বাস্থ্য ইনস্যুরেন্স চালু করা হবে।
- হেলথি এজিং স্কিমের আওতায় প্রবীণদের অসংক্রামক রোগব্যাধি নিরাময় এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র তৈরি করা হবে।
- সম্ভাব্য মহামারি/অতিমারি মোকাবিলার জন্য দেশের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানকে সকল যন্ত্রপাতি ও জনবল দিয়ে প্রস্তুত রাখা হবে। বিভাগীয় শহরে উন্নত মানের ল্যাবরেটরি স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- ভ্যাকসিন আবিষ্কারে শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং প্রবাসী বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের যৌথ উদ্যোগকে সরকার উৎসাহ ও সহায়তা দেবে।
- ভ্যাকসিন উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের টিকা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
- মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার ফলে ওষুধশিল্প যাতে মেধাস্বত্বের বাধা অতিক্রম করতে পারে, সেজন্য দেশে এপিআই (একটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট) শিল্প উৎসাহিত করা হবে এবং দেশে উৎপাদিত এপিআই ব্যবহার অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
- সকল স্তরে মানসিক স্বাস্থ্য ও অটিজম স্বাস্থ্যসেবা প্রদান অধিকতর কার্যকর করা হবে।

ঘ. সংস্কৃতি

বাঙালির জাতিসত্তার বিকাশে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে এবং পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের পর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে রাষ্ট্র ও সমাজে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে সাহিত্য ও সংস্কৃতি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভেতর দিয়েই সভ্যতা, মানবতা, বিশ্বজনীনতা, জাতীয়তা সমৃদ্ধ ও বিকশিত হয়। সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করতে আওয়ামী লীগ অঙ্গীকারবদ্ধ।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- জাতীয় পর্যায়ের কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজনায় 'মুজিব : একটি জাতির রূপকার' সিনেমা তৈরি করা হয়েছে, যা দেশে বিদেশে প্রদর্শিত হচ্ছে। এই চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও বঙ্গবন্ধুর অবদান সম্পর্কে জানার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ও শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জীবনীভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- দেশের সকল লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার, খুলনায় ১৯৭১ : গণহত্যা নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘরের জন্য নতুন ভবন নির্মাণ, চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স, শৈলজারঞ্জন সংস্কৃতি কেন্দ্র, উকিল মুন্সী স্মৃতিকেন্দ্র, মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি এবং ৮টি জেলায় নতুন শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ করা হয়েছে।
- শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী উৎসব আয়োজন করা হচ্ছে, যেখানে বিশ্বের প্রায় ১০০টি দেশ অংশগ্রহণ করেছে।
- ১০টি নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা, অনুষ্ঠান, ঐতিহ্য ইত্যাদি চর্চা ও বিকাশ অব্যাহত রয়েছে।
- দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলার ৩২০০টি নির্ধারিত এলাকায় জনসাধারণের দোরগোড়ায় লাইব্রেরিসেবা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৪৪টি দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে এবং আরো ৩৭টি দেশের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।
- ইউনেস্কো কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছে ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ফর ক্রিয়েটিভ ইকোনমি।
- বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রবর্তিত হয়েছে। যেখানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের গবেষকরা গবেষণার সুযোগ পাচ্ছেন।
- ২০০৯ সাল থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশের বাউলগান (২০০৮), জামদানি বয়নশিল্প (২০১৩), মঙ্গল শোভাযাত্রা (২০১৬), শীতলপাটি (২০১৭) এবং রিকশা ও রিকশা চিত্র (২০২৩) ইউনেস্কোর নির্বস্তুক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পেয়েছে, যা বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও সুনাম বৃদ্ধি করেছে।
- অমর একুশে গ্রন্থমেলাসহ দেশের ভেতর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত বইমেলার আয়োজন হচ্ছে। এছাড়াও ফ্রাঙ্কফুর্ট ও কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ এবং আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেন, দুবাইসহ বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের বইমেলার আয়োজন হচ্ছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- বাঙালি সংস্কৃতির আবহমান ঐতিহ্য ধারণ ও বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে মেলবন্ধন রচনার লক্ষ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা, নাটক, চলচ্চিত্র এবং সৃজনশীল সুকুমার শিল্পের উৎকর্ষ সাধনে আওয়ামী লীগ সরকার পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত রাখবে।
- জাতীয় সংস্কৃতি নীতি, ২০০৬ পরিমার্জনের মাধ্যমে সংস্কৃতি বিষয়ে বিশেষায়িত জাতীয় পরিষদ গঠন ও কার্যকর করা হবে।
- সকল ধর্মের শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন এবং সামাজিক সচেতনতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, সংস্কৃতির চর্চা ও উদার মানবিক চেতনা সৃষ্টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।
- লোকসংস্কৃতি ও লোকঐতিহ্য এবং নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনধারার বৈশিষ্ট্যসমূহ সুরক্ষা করা হবে।
- সাহিত্য-সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ যথা– বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি, শিশু একাডেমি, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে পরিচালিত হবে। জ্ঞানী-গুণীজনকে সংযুক্ত করে সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করা হবে।
- লোকঐতিহ্য তথা লোকমেলা, বইমেলা, যাত্রাপালা, নাটক, চলচ্চিত্র, নৃত্য-গীত ও অন্যান্য সুস্থ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বাধা, জঙ্গিদের হামলা ও অপপ্রচার নির্মূল করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।
- বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য অন্বেষণের জন্য গবেষণা, প্রত্নতাত্ত্বিক খনন, প্রত্নতত্ত্ব সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ এবং জাদুঘর গড়ে তোলা হবে।
- বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখা যেমন : কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গবেষণা, অনুবাদ, চারু ও কারুশিল্প, স্থাপত্য, আবৃত্তি, সংগীত, যাত্রা, নাটক, চলচ্চিত্র, সৃজনশীল প্রকাশনাসহ শিল্পের সব শাখার ক্রমাগত উৎকর্ষ সাধন ও চর্চার ক্ষেত্র প্রসারের জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বাড়ানো হবে।
- উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ ও গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে।
- শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে অসচ্ছল শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীদের সহায়তা কার্যক্রম আরও প্রসার ঘটানো হবে।
- স্থানীয় শিল্পী, কারিগর ও সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থান তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রত্নসম্পদ, ঐতিহাসিক স্থাপনার লোগোসংবলিত পণ্যাদি তৈরি, বিপণন ও দেশি-বিদেশি পর্যটকদের নিকট আকর্ষণীয় রূপে উপস্থাপনের লক্ষ্যে বিশেষ 'স্যুভেনির শপ' স্থাপন ও অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটিতে অফিস-কাম-মাল্টিফাংশনাল ভবন নির্মাণ করা হবে।
- দেশি-বিদেশি বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও সাহিত্য অনুবাদে সহায়তা করা হবে।
- প্রবাসে নতুন প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করে বাংলা সংস্কৃতি চর্চাকে উৎসাহিত করা হবে।
- লেখক-শিল্পীদের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক বলয় গড়ে তোলার প্রচেষ্টা উৎসাহিত করা হবে।

ঙ. ক্রীড়া

দেশপ্রেম, গণতান্ত্রিক চর্চা, নৈতিকতা ও মুক্ত মানসিকতাসম্পন্ন নাগরিক গড়ে তোলায় এবং সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী বাংলাদেশ বিনির্মাণে ক্রীড়ার ভূমিকা অপরিসীম। আওয়ামী লীগ সরকার ক্রীড়া চর্চা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ছাত্র ও

যুবসমাজের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটাতে অঙ্গীকারবদ্ধ। সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত এবং সুস্থ দেহ ও সবল মনের অধিকারী জনবল গড়ে তুলতে সরকার ক্রীড়াকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। ক্রীড়ায় প্রতিটি ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে মানোন্নয়ন করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অর্জন করা সরকারের লক্ষ্য।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- ক্রীড়াক্ষেত্রে অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে সরকার জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮; বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইন, ২০২০; শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার নীতিমালা, ২০২১ এবং বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া শিক্ষাবৃত্তি নীতিমালা, ২০২৩ প্রণয়ন করেছে।
- স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ক্রীড়াক্ষেত্রে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া শিক্ষাবৃত্তি চালু করা হয়েছে।
- গত ৫ বছরে ১৫০টি উপজেলায় ১৫০টি শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। ১৬১টি নির্মাণকাজ চলছে।
- জেলা পর্যায়ে ২টি স্টেডিয়াম, ৪টি সুইমিংপুল, ২টি মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স, ১২টি ইনডোর স্টেডিয়াম, ১টি হ্যান্ডবল স্টেডিয়াম নির্মাণসহ বিদ্যমান ২৮টি টেনিস কোর্টের আধুনিকায়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- জাতীয় পর্যায়ে ১টি রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স, ১টি বক্সিং স্টেডিয়াম, ১টি হ্যান্ডবল স্টেডিয়াম ও ১টি ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে।
- ক্রীড়া পরিদপ্তরের অধীন সারাদেশে প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের জন্য ক্রীড়া কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিবছর এসব কার্যক্রমে ৩ হাজার ২ শত জন প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশু অংশগ্রহণ করছে।
- ২০২২ সাল থেকে দেশের সকল উচ্চ মাধ্যমিক ও সমপর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তঃকলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট' চালু করা হয়েছে।
- 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' কর্তৃক অসচ্ছল, অসুস্থ ও অসমর্থ ক্রীড়াবিদকে আর্থিক ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে এবং ক্রীড়াশিক্ষার্থীদের মাঝে 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া শিক্ষাবৃত্তি' প্রদান করা হচ্ছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্রীড়া ক্লাব গড়ে তুলে বিনা মূল্যে ক্রীড়াসামগ্রী বিতরণ করা হবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে খেলার মাঠের উন্নয়ন, ক্রীড়া অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, খেলোয়াড়, কোচ, কর্মকর্তাসহ ক্রীড়াসংশ্লিষ্ট সকলের প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্প্রসারণে পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- প্রচলিত গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলাকে দেশব্যাপী জনপ্রিয় করে তোলা, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ক্রিকেটকে আরও সুদৃঢ় অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ফুটবল, হকি, শুটিং, আর্চারি, কাবাডিসহ সম্ভাবনাময় খেলাধুলাকে বিশ্বমানে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- ফুটবল ও অন্যান্য খেলায় আন্তর্জাতিক মান অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ সুবিধার সম্প্রসারণে পরিকল্পিত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে এক হাজারের বেশি খেলার মাঠ উন্নয়ন করা হবে।

- মাদক ও সন্ত্রাসমুক্ত স্মার্ট যুবসমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিদ্যমান ক্রীড়া অবকাঠামোর অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি বিভাগ পর্যায়ে জাতীয় ক্রীড়া কমপ্লেক্স, মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স এবং বিভাগীয় শহরগুলোতে শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ ও উন্নয়ন করা হবে।
- জেলা পর্যায়ে ইনডোর স্টেডিয়াম ও সুইমিংপুল এবং যুবকদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স তৈরি করা হবে।
- খেলাধুলার সার্বিক মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের সকল বিভাগে ১টি করে বিকেএসপির আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।
- উন্নত বিশ্বকে অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড়, সংগঠক ও প্রশিক্ষক তৈরির লক্ষ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ যেমন স্পোর্টস সাইকোলজি, বায়োমেকানিকস স্পোর্টস, ফিজিওলজি, স্পোর্টস ট্রেনিং এবং স্পোর্টস মেডিসিন কোর্স চালু করা হবে।

চ. শ্রমিক কল্যাণ ও শ্রমনীতি

শ্রমনীতি ও শ্রমিক কল্যাণে বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে আওয়ামী লীগ শাসনামলে শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃজন, শান্তিপূর্ণ শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখা, শিশুশ্রম নিরসন এবং দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। দেশের প্রচলিত আইন ও শ্রমের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড সমুন্নত রেখে শ্রমিক, মালিক ও সরকারপক্ষের সুসম্পর্ক নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উৎপাদনের অগ্রযাত্রা এবং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা হবে।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- ৪৩টি শিল্প সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। তৈরি পোশাকশিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের মজুরি ১ হাজার ৬৬২ টাকা থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে ২০২৩ সালে ১২ হাজার ৫০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের মজুরি ৪ হাজার ১৫০ টাকা থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে ৮ হাজার ৩০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের মজুরি বৈষম্য দূর করা হয়েছে।
- শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে গত ১০ বছরে ২৩ হাজার ৩৮৭ জন শ্রমিককে ১১ কোটি ১২ লাখ টাকার আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে শ্রমিকদের দুর্ঘটনাজনিত ও পারিবারিক কারণে গত ৬ বছরে ২০ হাজার শ্রমিককে ১৯৬ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'শিশুশ্রম নিরসন ও পুনর্বাসন প্রকল্প' নামে মেগা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- শিশুদের জন্য ৪৩টি কাজকে ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১ লাখ ৯০ হাজার শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।
- মানসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরির উদ্দেশ্যে 'গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড নীতিমালা' প্রণয়ন করা হয়েছে।

- শ্রমিকদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদানে স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য পোশাকশিল্প কারখানায় শ্রমিকদের তথ্যসংবলিত ডাটাবেজ প্রণয়ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল শ্রমিকের তথ্য ডাটাবেজ সফটওয়্যারে অন্তর্ভুক্ত করার কাজ চলছে।
- রপ্তানিমুখী খাতে ব্যবস্থাপক পর্যায়ে বিদেশি কর্মী নির্ভরতা কমানোর জন্য সরকারি-বেসরকারি ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৯ মাসের ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে।
- Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের মাধ্যমে গত ৭ বছরে প্রায় ৬ লক্ষ জন প্রশিক্ষণ পেয়েছে, তাদের মধ্যে ৪ লক্ষ ২৩ হাজার জনের কর্মসংস্থান হয়েছে, যার ৩৫ শতাংশ নারী।

আমাদের অঙ্গীকার

- আইএলও কনভেনশন এবং আইনে প্রদত্ত শ্রমিক অধিকার ও কল্যাণমূলক শর্তাবলি পালন অব্যাহত থাকবে।
- নারীর শ্রমে অংশগ্রহণের বাধা দূর করা এবং নারী শ্রমিক সংগঠন সুসংহত করা হবে।
- ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও পরিচালনার অধিকার, কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ, বিধিসম্মত শ্রমঘণ্টা নির্ধারণ, নিয়োগের নিরাপত্তা, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ, স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থান, চিত্তবিনোদন এবং শ্রম আইনে নির্ধারিত শ্রমিক কল্যাণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান অব্যাহত রাখা হবে।
- নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা, প্রশিক্ষণসহ কর্মসংস্থানসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ ডাটাবেজের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যতের শ্রমবাজারের চাহিদা অনুসারে কর্মপ্রত্যাশী ও কর্মসংস্থানকারীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হবে এবং কর্মসংস্থানের বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা হবে।
- পোশাকশিল্পে পরিকল্পিত অন্তর্ঘাত রোধ এবং শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব প্রদান অব্যাহত থাকবে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান

প্রবাসী কর্মীদের পাঠানো রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। আওয়ামী লীগ প্রবাসী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সুরক্ষার উদ্যোগকে আরও সম্প্রসারণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যার ফলে বিদেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রবাসী কর্মীদের ন্যূনতম খরচে বিদেশে গমন এবং প্রত্যাগমনকালে সাময়িকভাবে অবস্থানের জন্য নির্মিত 'বঙ্গবন্ধু ওয়েজ আর্নার্স সেন্টার'-এর মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- দেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও বিদেশে রপ্তানির জন্য প্রতিটি উপজেলায় টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি) স্থাপন করা হচ্ছে।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

- নারী কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন ও ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ এবং বিকেন্দ্রীকরণের ফলে প্রায় ১০ লক্ষ নারী কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন।
- পেশাজীবী, দক্ষ, আধা দক্ষ ও স্বল্প দক্ষ ক্যাটাগরিতে প্রায় সাড়ে ৮১ লক্ষ কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়েছে।
- নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের ফলে পোল্যান্ড, সেশেলস, আলবেনিয়া, রোমানিয়া, স্লোভেনিয়া, উজবেকিস্তান, বসনিয়া-হার্জেগোবিনা ও কম্বোডিয়ায় বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছে।
- বিদেশগামী প্রত্যেক কর্মীকে মাইক্রোচিপ-সংবলিত স্মার্ট কার্ড/বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে।
- রেমিট্যান্স বৃদ্ধির জন্য কর্মীদের প্রাক্-বহির্গমন অবহিত করা এবং বিভিন্ন কারিগরি কোর্সে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে; টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে জাপানি, ইংরেজি, কোরিয়ান ও চায়নিজ ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু করা হয়েছে।
- প্রবাসী ও প্রত্যাগত কর্মীদের জন্য বিমা, প্রবাসে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ, তাদের মেধাবী সন্তানদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি, অক্ষম প্রবাসী কর্মীদের চিকিৎসার্থে অর্থ সহায়তা, অনলাইন অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাসহ বহুবিধ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- দক্ষ শ্রমশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক চাহিদা বিবেচনায় ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রসার করা হবে।
- আওয়ামী লীগ বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের আইনসংগত সহায়তা দেওয়ার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা অব্যাহত রাখবে।
- বিদেশে নারী শ্রমিকদের প্রতি ন্যায্য আচরণ সংরক্ষণে আইনসংগত ব্যবস্থা নেবে।
- ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসীদের আয় গ্রহণ সহজ করার জন্য বিদেশি ব্যাংকগুলোর সঙ্গে দেশীয় মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা যুক্ত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ছ. নারীর ক্ষমতায়ন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারীর উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও সম-অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১৯৭২ সালে সংবিধানের ২৭ ও ২৮ নং অনুচ্ছেদে সকল নাগরিককে আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সম-অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। সে অনুযায়ী আওয়ামী লীগ নারীর ক্ষমতায়ন, উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা ও সম-অধিকার নিশ্চিতের লক্ষ্যে 'জাতীয় নারীনীতি ২০১১' প্রণয়ন করে। নারীনীতি অনুযায়ী সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে নারীর অগ্রগতি আজ দৃশ্যমান।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৫টি বাড়িয়ে ৫০টি করা হয়েছে। রাজনীতিতে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে নারী আসন এক-তৃতীয়াংশে উন্নীতকরণ ও সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- নারী ও শিশুর সুরক্ষায় আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০; নারী ও শিশু নির্যাতন আইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে, যার আলোকে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- নারীদের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার ৩৬ শতাংশ থেকে বেড়ে বর্তমানে ৪৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।
- নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে ১ হাজার ৫৩০ জন কর্মজীবী নারী শ্রমিকের জন্য স্বল্পমূল্যে আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- নারীদের ব্যবসা উদ্যোগকে সমর্থন ও সহায়তার জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে নারীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য অনলাইন মার্কেট প্লেস 'ই-জয়িতা' কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- নারী ও শিশুদের সেবা প্রদানের জন্য মোট ১৪টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, ৪৭টি জেলা সদর হাসপাতাল ও ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৬৭টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ২৪ ঘণ্টা হটলাইন সেবা ১০৯ চালু করা হয়েছে।
- গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের ই-কমার্সে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ই-কমার্স মার্কেট প্লেস 'লালসবুজডটকম' প্ল্যাটফর্মের উন্নয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে সাড়ে ১৪ হাজার উদ্যোক্তা 'লালসবুজ ডটকম' এ নিবন্ধন ও পণ্য আপলোড করে বিক্রয় করছেন।
- গ্রামীণ সুবিধাবঞ্চিত নারীদের তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকারের লক্ষ্যে 'তথ্য আপা : ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রকল্প দেশের ৪৯০টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর মাধ্যমে নারীদের আত্মনির্ভরশীল করা এবং তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- জেন্ডার সমতার জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিকৌশল গ্রহণ ও তার কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে World Economic Forum-এর Gender Gap ২০২২ সালে ১৪৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৫৯তম অবস্থানে উঠে এসেছে। সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে।
- কর্মজীবী মায়েদের নিরাপদে কাজ সম্পাদনের নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য ১২৫টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫ হাজার ৭৩০ জনকে দিবাকালীন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- নারীর জন্য শোভন কর্মসৃজনের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। নারীদের জন্য নির্ধারিত নিয়মিত সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের বাইরে তাদের আত্মকর্মসংস্থান ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ৬৪টি জেলার ৪৮৮টি উপজেলার মাধ্যমে ২.২৭ লক্ষ জনকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হচ্ছে। নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে কোনো জামানত ছাড়াই সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা এসএমই ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- বিগত দেড় দশকে উপবৃত্তি, বিনা মূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ এবং অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়ার ফলে নারী শিক্ষার হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মেয়েদের ভর্তির হার এখন ৫১ শতাংশ এবং মাধ্যমিকে তা ৫৩ শতাংশ।
- শিক্ষা খাতের পাশাপাশি অর্থনীতিতে বাংলাদেশের নারীদের অংশগ্রহণ ক্রমবর্ধমান। জিডিপিতে নারীর অবদান প্রায় ২০ শতাংশ।
- কর্মজীবী নারীর অংশগ্রহণ সহজ করতে মাতৃত্বকালীন ছুটি ১২০ দিন এবং ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। প্রান্তিক নারীদের স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে খোলা হয়েছে গ্রামভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিক।

- সকল জেলায় নারী নির্যাতন সংশ্লিষ্ট মামলা-মোকদ্দমার জন্য জেলা জজের সমমর্যাদায় পৃথক আদালত স্থাপন করা হয়েছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- সরকারের উন্নয়ন ও প্রশাসন কার্যক্রম নারী নীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে প্রণীত হওয়ার ধারা অব্যাহত থাকবে।
- নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার সমতা, অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নারী উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। গ্রামীণ নারীদের সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং শ্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে।
- আওয়ামী লীগ থেকে ক্রমেই বেশিসংখ্যক নারী সাধারণ আসনে নির্বাচিত হচ্ছেন। আওয়ামী লীগের লক্ষ্য রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়ও কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ নারীর অংশীদারত্ব নিশ্চিত করা।
- কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা, কর্মবান্ধব পরিবেশ, মাতৃত্বকালীন ছুটি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত থাকবে। দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র (ডে-কেয়ার সেন্টার) এবং কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ঢাকা ও জেলা সদরে হোস্টেল নির্মাণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে।
- আওয়ামী লীগ সরকার নারী ও শিশু পাচার কঠোর হাতে দমন এবং পাচার রোধে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করেছে, যা অধিকতর সক্রিয় ও কার্যকর করা হবে।
- নারী উদ্যোক্তা এবং স্টার্টআপদের জন্য বিশেষ করে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন খাতে আর্থিক সহায়তা, পরামর্শদান এবং সংস্থান নিশ্চিত করা হবে। ই-কমার্সের সঙ্গে সংযুক্ত নারীদের বা নারী মালিকানাধীন ব্যবসার জন্য অনুদান, ঋণ ও বিনিয়োগ উদ্যোগের মাধ্যমে পুঁজির অভিগম্যতা সহজতর করা হবে।
- দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীর অনুপাত প্রায় সমান এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নারী শিক্ষার্থী ৩৬.৩০ শতাংশ। উচ্চশিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে নারী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান এবং কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- নারী উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী গড়ে তোলার কাজে 'জয়িতা ফাউন্ডেশন'-এর কার্যকর ভূমিকা সম্প্রসারিত হবে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের আওতায় ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় সদরে এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নারীবান্ধব বিপণন অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে।
- নারী নির্যাতনসংশ্লিষ্ট পৃথক আদালতের মামলায় বাদীপক্ষকে সরকারি খরচে আইনি সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করা হবে।
- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ কার্যকর করার ব্যাপারে অধিকতর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জ. শিশু কল্যাণ

শিশুর কল্যাণ ও সুরক্ষায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের সংবিধানে শিশুর সকল অধিকার নিশ্চিত করেন এবং ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন ও প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেন। এটিকে অনুসরণ করে বিগত ১৫ বছরে আওয়ামী লীগ সরকার শিশুর কল্যাণ, নিরাপত্তা এবং উন্নয়ন ও বিকাশে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ শিশু। এসব শিশু-কিশোরই বড় হয়ে আগামী দিনে

দেশকে পরিচালনা করবে। সে জন্য শিশু-কিশোরদের যথাযথ বিকাশ ও নিরাপত্তা বিধান করে ভবিষ্যতের জন্য দেশপ্রেমিক ও যোগ্য-সক্ষম সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে কর্মপ্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিদ্যমান মাতৃত্বকালীন ভাতা এবং শহর অঞ্চলের কম আয়ের কর্মজীবী মায়েদের জন্য ল্যাকটেটিং ভাতা কর্মসূচি দুটিকে সমন্বিত করে 'মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি' নামে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কার্যক্রম জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর আওতায় মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে শিশুর চার বছর বয়স পর্যন্ত পুষ্টি চাহিদা পূরণ, শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এর প্রভাবে ভবিষ্যতে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হ্রাস, শীর্ণকায় ও খর্বকায় শিশুর সংখ্যা আরও কমে আসবে।
- ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত এক লক্ষ শিশু শ্রমিককে উপানুষ্ঠানিক ও কারিগরি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যে শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২৫ চূড়ান্ত করা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ ৮টি সেক্টরকে 'শিশুশ্রম মুক্ত' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
- শিশুদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ স্থাপন কার্যক্রম পূর্বের ধারাবাহিকতায় অব্যাহত থাকবে। শিশুবান্ধব কর্মস্থল সৃষ্টির কাজ চলছে।
- নারী ও শিশুর নিরাপত্তায় ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ও ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেলের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৮টি রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- শিশুর বিকাশ ও কল্যাণে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ৬টি জেলা শাখায় আধুনিক কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। শিশু একাডেমিতে প্রতিবছর প্রায় ৩৫ হাজার শিশু বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে, যার মাধ্যমে শিশুদের সুকুমারবৃত্তির বিকাশ ঘটছে।
- শিশুকল্যাণ ট্রাস্টের অধীনে সারাদেশে ২০৫টি শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৯টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এর উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার। পিতা-মাতাহীন শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও সামাজিকীকরণের লক্ষ্যে সরকারিভাবে শিশুসদন স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৭৩টি শিশুসদন রয়েছে।
- এতিম, দুস্থ শিশুদের পারিবারিক পরিবেশে গড়ে তোলার জন্য সরকারিভাবে সারাদেশে ১১২টি শিশু পরিবার গড়ে তোলা হয়। অনাথ ও এতিম শিশুদের লালনপালনের জন্য সরকারি অনুমোদনে সারাদেশে ৪৮টি এতিমখানা চালু করা হয়েছে। এ ছাড়া দুস্থ শিশুদের পুনর্বাসনের জন্য সারাদেশে ৫৬টি শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের সার্বিক কল্যাণ বিশেষ করে শিক্ষাদান নিশ্চিত করতে ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রামে ৫টি করে অন্ধ স্কুল, ৭টি করে মূক ও বধির স্কুল ও ৫টি করে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।
- সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ভাগ্যোন্নয়নে 'শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০২৩' প্রণয়ন করা হয়েছে।
- সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল-এর আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ নির্মূলের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- শিশু-কিশোরদের ভবিষ্যতের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যথাযথ শারীরিক ও মানসিক বিকাশে পুষ্টি, শিক্ষা ও বিনোদনের উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করার কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
- পথশিশুদের পুনর্বাসন ও নিরাপদ আবাসন, হতদরিদ্র ও ছিন্নমূল শিশুদের জন্য শিশুসদন প্রতিষ্ঠা এবং প্রাথমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের কর্মসূচি কার্যকর ও প্রসার করা হবে।
- শিশুশ্রম বন্ধ করার জন্য পর্যায়ক্রমে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হবে।
- আওয়ামী লীগ শিশু-কিশোরদের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করা এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- কন্যাশিশুদের প্রতি বৈষম্য, নির্যাতন বন্ধ ও তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।
- অটিস্টিক শিশুদের জন্য গৃহীত বিশ্বে সমাদৃত কার্যক্রমের পরিধি বাড়ানো হবে।
- কিশোরী ক্ষমতায়নে স্কুলগামী ছাত্রীদের বাইসাইকেল প্রদান অব্যাহত থাকবে।
- ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের অপুষ্টি মোকাবিলায় বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- শিশু-কিশোরদের বিনোদনের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতে খেলার মাঠ ও শিশু পার্ক গড়ে তোলা হবে।
- শিশু-কিশোরদের জন্য নিরাপদ সোশ্যাল মিডিয়া ও নিরাপদ ইন্টারনেট নিশ্চিতে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝ. মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অবিনশ্বর, জাতির লক্ষ্য অর্জনের পাথেয়। মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত ও মুক্তিযোদ্ধাদের হেয় করার অপচেষ্টা চলে। জাতির দুর্ভাগ্য যে, এই অপচেষ্টা এখনো অব্যাহত রয়েছে। তাই মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জনগণ বিশেষত তরুণসমাজের মধ্যে প্রচার করা, তাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ করা, মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্য ও স্মৃতি সংরক্ষণ করা, মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা, কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের বিকৃতি রোধে যথাযথ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আওয়ামী লীগ অঙ্গীকারবদ্ধ।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের সার্বিক কল্যাণে সরকার নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। তাতে মুক্তিযোদ্ধারা রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে যোগ্য সম্মান ও মর্যাদা পাচ্ছেন।
- বিভিন্ন জাতীয় দিবসের কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের সমন্বিত তালিকা প্রণয়ন, গেজেট প্রকাশ, সনদ ও প্রত্যয়নপত্র প্রদান, MIS-এর মাধ্যমে সম্মানী ভাতা প্রদান, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাসংক্রান্ত নীতিমালা/বিধি প্রণয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে।
- শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধার সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ, ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতাস্তম্ভ নির্মাণ, মুক্তিযুদ্ধকালে

মিত্রবাহিনীর শহিদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন প্রকল্প, বীরের কণ্ঠে বীরগাথা শীর্ষক প্রকল্প, পাঠাগার ও জাদুঘর নির্মাণ, সকল জেলা ও উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ইত্যাদি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান।

- বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের সম্মানী ভাতা ১০ হাজার টাকার স্থলে ২০ হাজার টাকা, বর্তমানে যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের ক্যাটাগরি ভেদে ২৭ হাজার থেকে ৪৫ হাজার পর্যন্ত, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ৩০ হাজার এবং খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের পরিবার ২০ হাজার থেকে ৩৫ হাজার টাকা সম্মানী ভাতা পাচ্ছেন।
- মুক্তিযোদ্ধারা ২ হাজার টাকা হারে বাংলা নববর্ষ ভাতা এবং জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা হারে জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে মহান বিজয় দিবস ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।
- বীর মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসা বাবদ বার্ষিক সর্বোচ্চ ৭৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়। বিশেষায়িত হাসপাতালে জটিল রোগের চিকিৎসা বা জরুরি অপারেশন প্রয়োজন হলে বিশেষায়িত হাসপাতাল কর্তৃক সর্বোচ্চ ৩ লাখ টাকা ব্যয় করা যায়।
- বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারবর্গের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে আবাসন প্রকল্প 'বীর নিবাস'। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে মোট ৩০ হাজার বীর নিবাস নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫ হাজার বীর নিবাস নির্মাণ করে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের মাঝে হস্তান্তর করা হয়েছে।
- ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৩৫২ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে ডিজিটাল সনদ এবং ৯৫ হাজার ২৪৫ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে স্মার্ট আইডি কার্ড প্রদান করা হয়েছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় অসংগতি দূর এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে।
- আওয়ামী লীগ সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের স্বীকৃতি এবং তাঁদের জন্য যেসব কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, সেগুলো অব্যাহত রাখা হবে। ক. মাসিক ও উৎসব ভাতা; খ. দুস্থ ও বৃদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বার্ধক্যকালীন ভরণপোষণ ও বিনা মূল্যে চিকিৎসা; গ. উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ অব্যাহত থাকবে। পর্যায়ক্রমে এসব কল্যাণ কর্মসূচি আরও উন্নত করা হবে।
- ষাট ও তদূর্ধ্ব বয়সের মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানিত নাগরিক হিসেবে রেল, বাস ও লঞ্চে বিনা মূল্যে চলাচলের সুযোগ অব্যাহত থাকবে।
- মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সুরক্ষা, ইতিহাস বিকৃতি রোধ এবং প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার জন্য বিশেষ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষত কওমি, ইবতেদায়িসহ সকল মাদ্রাসায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্তি এবং পাঠদান নিশ্চিত করার কার্যক্রম চলবে।
- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমস্যা ও অভিযোগ শোনা এবং সমাধানের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে হটলাইন সার্ভিস চালু করা হবে।

ঞ. প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ কল্যাণ

প্রতিবন্ধী

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজেরই অংশ। আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মেধার বিকাশ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যা ধারাবাহিকভাবে সারাদেশে প্রসারিত হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করে সমাজের সকল পর্যায়ে তাদের একীভূত করতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বদ্ধপরিকর।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- আওয়ামী লীগই ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় দেশের প্রথম আইন প্রণয়নের অঙ্গীকার করে।
- বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৮ এবং প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় 'জাতীয় কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা : ২০১৬ থেকে ২০৩০' প্রণয়ন করেছে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠায় 'জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন, ২০২৩' প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২৯ লক্ষ ১০ হাজার জন করা হয়েছে এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ৬০০ থেকে বৃদ্ধি করে ৮৫০ টাকা করা হয়েছে।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির পরিমাণ বাড়িয়ে মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ থেকে ৯৫০ টাকা করা হয়েছে। এছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৯০০ থেকে ৯৫০ টাকা করা হয়েছে।
- দেশের ৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় মোট ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়। এসব সেবাকেন্দ্র থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত নিবন্ধিত সেবাগ্রহীতার সংখ্যা ৮ লক্ষ ৯ হাজার ৩৮০ জন ও মোট প্রদত্ত সেবার সংখ্যা ১ কোটি ৫ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭১৫টি।
- ঢাকায় ৪টি, ৬ বিভাগে ৬টি, গাইবান্ধায় ১টি মোট ১১টি স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইদ অটিজম চালু এবং অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ও এনডিডি শিশুদের ৭৯২ জন পিতামাতা-অভিভাবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- অটিজম শনাক্তকরণ ও মাত্রা নিরূপণের জন্য সরকারি উদ্যোগে 'স্মার্ট অটিজম বার্তা' ও 'বলতে চাই' নামক অ্যাপস চালু করা হয়েছে।
- বিভিন্ন ধরনের থেরাপি যন্ত্রপাতি, সুবিধাদিসহ ৩২টি বিশেষ ধরনের ভ্রাম্যমাণ মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের থেরাপিউটিক সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে চাকরিপ্রত্যাশী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ২০ আসনবিশিষ্ট ১টি পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল চালু করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৩০ থেকে ৪০-এ উন্নীত করা হয়েছে।

- নিউরো-ডেভেলপমেন্ট ডিজঅ্যাবিলিটিস (এনডিডি) বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বিমা' চালু করা হয়েছে। তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং জীবনমান উন্নয়নে 'নিউরো-ডেভেলপমেন্ট প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট' আইনের মাধ্যমে একটি ট্রাস্ট স্থাপন করা হয়েছে।
- দেশের ১৪টি স্থানে পাইলট প্রকল্প হিসেবে ১৪টি 'অটিজম ও এনডিডি সেবাকেন্দ্র' প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সারাদেশে সম্প্রসারণ করা হবে।
- অটিজম বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়ায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে 'হু অ্যাক্সিলেন্স' অ্যাওয়ার্ড এবং ২০২৩ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত করেছে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জব ফেয়ারের আয়োজন করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা অনুসারে সব ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ন্যূনতম ৫ শতাংশ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরগুলো কাজ করে যাচ্ছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তকরণের সুযোগ সম্প্রসারণ করা হবে।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা যাতে তাদের জন্য উপযোগী পরিবেশে শিক্ষা লাভ করতে পারে, সে ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সরকারি পরিষেবার দপ্তরগুলো প্রতিবন্ধীবান্ধব হিসেবে রূপান্তর করা হবে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহজতর উপায়ে সরকারি অনুদান ও ঋণ প্রদান করা হবে এবং তাদের জন্য উপযোগী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- প্রতিবন্ধী মানুষের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, চলাফেরা, যোগাযোগ, চিকিৎসা অধিকতর সহজ এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা হবে।
- সারাদেশে দুই ধাপে আরও ৪২২টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
- নিউরো-ডেভেলপমেন্ট ডিজঅ্যাবিলিটিস (এনডিডি) বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের জন্য আট বিভাগে আটটি চিকিৎসা, শিক্ষা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি উন্নয়ন অধিদপ্তর বাস্তবায়নে আইনি জটিলতা দূর করা হবে।
- শিক্ষা ও চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় অভিন্ন জাতীয় শ্রুতলেখক নীতিমালা প্রণয়ন, বিসিএসসহ সকল সরকারি নিয়োগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দকৃত কোটার যথাযথ বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোতে তাদের অংশগ্রহণের জন্য এবং ভোটদানে উৎসাহিত করা হবে।

প্রবীণ কল্যাণ

প্রবীণেরা সমাজে বটবৃক্ষের মতো। প্রবীণদের কর্মপ্রচেষ্টা ও অভিজ্ঞতার আলোকে সমাজ ও রাষ্ট্র অগ্রসর হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে প্রবীণ হিতৈষী সংঘকে সুসংগঠিত করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। দেশে গড় আয়ু বৃদ্ধির কারণে প্রবীণ মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রবীণ

জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ, যা মোট জনসংখ্যার ৯ শতাংশ। ২০২৫ সালে বাংলাদেশে প্রবীণদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ২ কোটি এবং ২০৫০ সালে তা ৪ কোটি ৫০ লাখে উন্নীত হবে। প্রবীণদের ক্রিয়াশীল রাখতে, সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রগতিতে তাঁদের অবদান যোগ করতে এবং তাঁদের সুরক্ষায় সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে আওয়ামী লীগ সরকার।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- সরকার 'সিনিয়র সিটিজেন নীতিমালা', 'জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা, ২০১৩' এবং 'পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন, ২০১৩' অনুমোদন করেছে। যার ফলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রবীণদের অর্থকষ্ট লাঘব, মানমর্যাদা বৃদ্ধি এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কর্মময়, সুস্থ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে।
- প্রবীণদের কল্যাণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান'টিকে স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ কয়েকটি কার্যকরী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিবন্ধন এবং বার্ষিক অনুদানের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।
- প্রবীণদের সুরক্ষায় হিতৈষী সংঘের প্রবীণ স্বাস্থ্যসেবা খাতে অনুদান বৃদ্ধি এবং প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ৫৮ লক্ষ ১ হাজার জনকে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হয়েছে এবং ভাতার পরিমাণ ৫০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- স্বজন ও আশ্রয়হীন প্রবীণ ব্যক্তিদের মানসম্মত আবাসন নিশ্চিতকল্পে সারা দেশে ৮ বিভাগে ৮টি শান্তিনিবাস স্থাপন করা হয়েছে।
- ২৬২টি উপজেলার শতভাগ প্রবীণকে বয়স্ক ভাতার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলার প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে বয়স্ক ভাতার আওতায় নিয়ে আসা হবে।

আমাদের অঙ্গীকার

- প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সামাজিক বিমার আওতায় নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- আন্তঃপ্রজন্ম সম্পর্ক, সংহতি ও অংশীদারত্ব গড়ে তোলা এবং প্রজন্মের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন, সংহতি ও ঐক্য সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- প্রবীণদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান ও রেশনিং ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- প্রবীণ নাগরিকদের ডিজিটাল প্রযুক্তির সকল সুযোগ-সুবিধা ও প্রযুক্তিগত সমতা অর্জনে এবং প্রবীণদের কল্যাণে উন্নত ও আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- জেরিয়াট্রিক মেডিসিনের (প্রবীণদের স্বাস্থ্য ও পরিচর্যাসংক্রান্ত) জন্য পৃথক কোর্স, ডিগ্রি, হাসপাতালে চিকিৎসা সেবার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। জেরিয়াট্রিক স্বাস্থ্য সেবা সহজতর ও আধুনিক করার লক্ষ্যে মেডিকেল কলেজগুলোতে আলাদা ডিগ্রির ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- ঢাকার আগারগাঁও এলাকায় প্রবীণ হাসপাতাল রয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইতোমধ্যে জেরিয়াট্রিক সেবা চালু হয়েছে। দেশের সকল সরকারি হাসপাতালে জেরিয়াট্রিক সেবা প্রচলনের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ট. ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৪৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ৩০ লক্ষের অধিক জনসংখ্যা বসবাস করছে। বাংলাদেশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে তাদের জীবন, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও আশা-আকাঙ্ক্ষা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘুসহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সম-অধিকার ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সেই আলোকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অবসান ঘটানো; তাদের জীবন, সম্পদ, উপাসনালয় ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় এবং জীবনমানের উন্নয়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

> "সাম্প্রদায়িকতা যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ। মুসলমান তার ধর্মকর্ম করবে। হিন্দু তার ধর্মকর্ম করবে। বৌদ্ধ তার ধর্মকর্ম করবে। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না।"
>
> - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের জমি, বসতভিটা, উপাসনালয়, বনাঞ্চল, জলাভূমি ও অন্যান্য সম্পদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জমি ও বন এলাকায় অধিকার সংরক্ষণের জন্য ভূমি কমিশনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণকে সমাজের ও উন্নয়নের মূল স্রোতে আনার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- অনগ্রসর ও অনুন্নত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও চা-বাগান শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে বিশেষ কোটা এবং সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত আছে।
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়গুলোর বৈচিত্র্যময় রীতিনীতি ও ঐতিহ্যগুলোকে সংরক্ষণ এবং প্রদর্শন করার জন্য সরকারের তরফ থেকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।
- বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জাতিগত সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয় আঞ্চলিক পরিষদ এবং জেলা পরিষদের কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে। ফলে স্থানীয়, ভৌগোলিক, আর্থসামাজিক পরিবেশ বিবেচনায় নিয়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- তিন পার্বত্য জেলায় পর্যটনশিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্পের বিকাশে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উচ্চমূল্যের মসলা চাষ, কফি-কাজুবাদাম চাষ, তুলা চাষ, সৌরবিদ্যুৎ ইত্যাদি জনমুখী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- মন্দির, শ্মশান, প্যাগোডা, গির্জা, সিমেট্রির উন্নয়নে অনুদান প্রদান ও উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টসমূহের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে নিয়মিত কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত আছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৩(ক) তে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।' সংবিধানের এই ধারা সুরক্ষায় উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।
- আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে জাতীয় সংসদে অর্পিত সম্পত্তি আইন সংশোধন করা হয়েছে এবং অর্পিত সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট সমস্যা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আইন প্রয়োগে বাধা দূর করা হবে।
- সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন এবং সংখ্যালঘু বিশেষ সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হবে। আওয়ামী লীগ ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আবশ্যক পদক্ষেপ নেওয়া অব্যাহত রাখবে।
- বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের 'এথনিক ক্লিনজিং' অপনীতির কবলে পড়ে দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হিংস্র আক্রমণ ও বৈষম্যের শিকার হয়। ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অসংখ্য নর-নারী নিহত হয়েছে; অসংখ্য নারী হয়েছে ধর্ষণের শিকার; তাদের ঘরবাড়ি, জমি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দখল ও লুণ্ঠিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ এই অমানবিক ঘটনাগুলোর বিচারকার্য সম্পন্ন করবে এবং তার পুনরাবৃত্তি হতে দেবে না।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও চা-বাগানে কর্মরত শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর ওপর সন্ত্রাস, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের চির অবসান, তাদের জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রম, মান-মর্যাদার সুরক্ষা এবং রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার নিশ্চিত করার নীতি অব্যাহত রাখবে।
- বস্তি, চর, হাওর, বাঁওড়, উপকূলসহ দেশের সকল অনগ্রসর অঞ্চলের সুষম উন্নয়ন এবং ওই সব অঞ্চলের জনগণের জীবনের মানোন্নয়ন অগ্রাধিকার পাবে।

ঠ. অনগ্রসর জনগোষ্ঠী

দলিত ও অবহেলিত জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি অংশ দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায়। সমাজে চরমভাবে অবহেলিত, বিচ্ছিন্ন, উপেক্ষিত এই জনগোষ্ঠী। তাদের জীবনমান উন্নয়ন এবং তাদের মূল স্রোতে নিয়ে আসার কর্মসূচি বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগ অঙ্গীকারবদ্ধ।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- দলিত, হরিজনদের জন্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ফ্ল্যাট নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে।
- মান্ডা, হিজরা, কুষ্ঠ রোগীদের অর্থ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। ২ কাঠা জমিতে ঘর করে দেওয়া হয়েছে।

- ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে পাইলট কর্মসূচির মাধ্যমে ৭টি জেলায় বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এই কর্মসূচি সম্প্রসারণ করে মোট ৬৪ জেলায় এই কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি স্বতন্ত্র দুটি কর্মসূচিতে বিভক্ত করা হয়। দুটো কর্মসূচিই সম্প্রসারিত করা হয়েছে।
- অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমে উপকারভোগীর সংখ্যা ৮২ হাজার ৫০৩ জনে উন্নীত হয়েছে। বিশেষ ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫৪ হাজার ৩০০ জনে উন্নীত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হবে।
- বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে। যাতে তারা আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়ে সমাজের মূল স্রোতোধারায় আসতে পারে।
- অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য নগদ সাহায্য ও বাসস্থান প্রদান কর্মসূচি সারা দেশে সম্প্রসারণ করা হবে।

হিজড়া জনগোষ্ঠী

হিজড়া সম্প্রদায় বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ। আবহমানকাল থেকেই এ জনগোষ্ঠী সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ও উপেক্ষিত, মানবেতর জীবনযাপন করছে। আওয়ামী লীগ সরকার হিজড়া সম্প্রদায়ের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতোধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নানা কল্যাণমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হয়। হিজড়া জনগোষ্ঠীর ভাতাভোগীর সংখ্যা ২০০৬ সালে ১ হাজার ১২ জন ছিল, যা ২০২২-২৩ সালে ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৬ হাজার ৮৮৪ জন হয়েছে। বিশেষ ভাতা পান ৫ হাজার ৬২০ জন।
- ২০১৪ সালে হিজড়া জনগোষ্ঠীকে 'তৃতীয় লিঙ্গ' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯ সালে হিজড়ারা স্বতন্ত্র লৈঙ্গিক পরিচয়ে ভোটাধিকার লাভ করে।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ৬৪টি জেলায় হিজড়া জনগোষ্ঠীর ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে এ কর্মসূচির ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তির নগদ সহায়তা উপকারভোগীর মোবাইল হিসাবে দেওয়া হচ্ছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- হিজড়াদের সমাজের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ, শিক্ষা, বাসস্থান ও জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।
- হিজড়া জনগোষ্ঠীর জন্য নগদ সাহায্য ও বাসস্থান প্রদান কর্মসূচি সারা দেশে সম্প্রসারণ করা হবে।

ড. জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সুরক্ষা

গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ২০২১ অনুযায়ী বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ১০টি দেশের মধ্যে সপ্তম অবস্থানে রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করা ও খাপ খাইয়ে চলা বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় ভৌত-প্রাকৃতিক চ্যালেঞ্জ। একই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন, নগরায়ণ, আধুনিকায়ন এবং জনসংখ্যা-উৎপাদন-ভোগ বৃদ্ধির পরিবেশগত অভিঘাত সুষ্ঠুভাবে মোকাবিলা করা আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই দুই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিগত সময়কালে আওয়ামী লীগ সরকার যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে এবং আগামীতে এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- ২০২৩ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে (কপ২৮) জলবায়ুবিষয়ক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্বের কণ্ঠস্বর হিসেবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা মানুষের পক্ষে বিশ্বব্যাপী অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'ক্লাইমেট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করা হয়। জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা সমর্থিত গ্লোবাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট মোবিলিটি (জিসিসিএম) তাঁকে এ পুরস্কারে ভূষিত করে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য ২০০৯ সালে Bangladesh Climate Change Strategic and Action Plan (BCCSAP) তৈরি করা হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ডলারের বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। এ ফান্ডের অর্থায়নে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- ২০১৮ সালে সরকার অংশীজনের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে 'জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা' প্রণয়ন করে। এই পরিকল্পনায় ১৪টি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ ও ১১টি 'জলবায়ু সংকটাপন্ন এলাকা' চিহ্নিত করে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
- ১০টি প্রস্তাবিত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেগুলোর মধ্যে ৫টি প্রকল্প সম্পূর্ণ বাতিল এবং বাকি ৫টি কয়লার পরিবর্তে গ্যাসে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
- ২০১৫ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের 'প্যারিস চুক্তি' স্বাক্ষর করে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যমান প্রবণতার তুলনায় উষ্ণতা বৃদ্ধিকারক গ্যাসের উদ্‌গিরণ শর্তহীনভাবে ৬.৭ শতাংশ এবং শর্তাধীনভাবে আরও ১৫.১ শতাংশ হ্রাসে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে জলবায়ু অর্থায়নের জন্য 'মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্ল্যান' গ্রহণ করা হয়েছে।
- উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃজন এবং বনায়নের ব্যাপক কর্মসূচির আওতায় ২০০৯-১০ থেকে ২০২১-২২ সালের মধ্যে ম্যানগ্রোভ বনসহ প্রায় দুই লক্ষ হেক্টর বনায়ন ব্লক এবং ২৮ হাজার ৪৫৮ কিলোমিটার সরু বাগান সৃজন করা হয়েছে।
- শিল্পদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ২০২১ সাল পর্যন্ত ২,২২০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপিত হয়েছে এবং প্লাস্টিক বর্জ্য হ্রাসের লক্ষ্যে সারাদেশে একবার ব্যবহৃতব্য প্লাস্টিক দ্রব্যাদি ব্যবহার কমানো এবং এগুলোর প্রাকৃতিক বিকল্প ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

- দেশবাসীকে বাসযোগ্য পরিবেশ উপহার দেওয়ার লক্ষ্যে বায়ুদূষণ, পানিদূষণ ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কার্যকর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- পাহাড় ও টিলা কর্তন এবং পুকুর ও জলাশয় ভরাট রোধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে।
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ২৫ মিলিয়ন মানুষ সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের সুবিধা পাচ্ছে। কৃষিতে ডিজেলচালিত পানির পাম্পের বিকল্প হিসেবে সৌর সেচপাম্প স্থাপন উৎসাহিত করা হচ্ছে।
- রান্নার কাজ থেকে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে ২০ লাখ উন্নত চুলা সরবরাহ করা হয়েছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা, দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা এবং পানিসম্পদ রক্ষায় ইতোমধ্যে সরকার যে সকল নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, তার বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে : ক. উৎপাদনশীল/সামাজিক বনায়ন ২০ শতাংশে উন্নীত; খ. ঢাকা ও অন্যান্য বড় নগরে বায়ুর মান উন্নয়ন; গ. শিল্পবর্জ্যের শূন্য নির্গমন/নিক্ষেপণ প্রবর্ধন; ঘ. আইনসংগতভাবে বিভিন্ন নগরে জলাভূমি সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা; ঙ. সমুদ্র উপকূলে ৫০০ মিটার বিস্তৃত স্থায়ী সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা।
- পরিবেশের ওপর প্লাস্টিক পণ্যের বিরূপ প্রভাব নিয়ন্ত্রণে প্লাস্টিক পণ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব ও পচনশীল প্লাস্টিকের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হবে।
- দেশের মোট জ্বালানিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ ২০৪১ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ অর্জনে জোরালো প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।
- ভূ-উপরিস্থ পানির যুক্তিসংগত ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।
- সুন্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বন সংরক্ষণে অগ্রাধিকারসহ দেশের বনসম্পদ রক্ষা, বন সৃজন, বন্য প্রাণী, অতিথি পাখিসহ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।
- সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও লবণাক্ততা রোধ এবং সুন্দরবন ও অন্যান্য অববাহিকা অঞ্চলে মিঠাপানির অভাব দূর করার ব্যবস্থা বাড়ানো হবে।
- দেশের বিস্তীর্ণ হাওর ও ভাটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।
- নেপাল ও ভারতের সঙ্গে সপ্তকোষী প্রকল্পে বাংলাদেশের ন্যায্য অংশীদারত্ব অর্জনের চেষ্টা করা হবে।

ঢ. এনজিও ও সরকার

- সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সরকারের বিধি অনুযায়ী নিবন্ধিত হবে। সরকার তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে।
- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজস্ব বিধি মোতাবেক পরিচালিত হবে। দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান বিষয়ে নিজস্ব বিধি ও রীতি অনুযায়ী কাজ করার অধিকার অব্যাহত রাখা হবে।

- সরকারি প্রতিষ্ঠান/বিভাগ ও স্থানীয় সরকার এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় অধিক ফলপ্রসূ করা হবে।
- অর্থায়নকারী অন্যান্য এনজিওর সকল কার্যক্রম ও আয়-ব্যয়ের হিসাব স্বচ্ছ এবং স্থানীয় জনগণ ও সরকারি নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।
- এনজিও সংস্থা সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করলে অথবা শিল্প ও বাণিজ্যে ভূমিকা রাখলে দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় পড়বে এবং এনজিও হিসেবে কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পাবে না। লভ্যাংশের যে অংশ জনসেবায় ব্যয় হবে, তা কর রেয়াতির জন্য বিবেচনাযোগ্য হবে।

৩.৫ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব

ক. পররাষ্ট্র

এক অস্থিতিশীল বিশ্বব্যবস্থায় বিশ্বের সকল দেশ যখন কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে তাদের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে, ঠিক সেরকম এক জটিল বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদে নির্দেশিত 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়' এই নীতিকে ধারণ করে আওয়ামী লীগের সফল পররাষ্ট্রনীতির কল্যাণে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এক শক্তিশালী ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং ভূরাজনৈতিক কৌশল, সংকট ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সমৃদ্ধি ও বৈশ্বিক শান্তির প্রতি তার অবিচল অঙ্গীকারের সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- ভারতের সঙ্গে স্থল সীমানা নির্ধারণ ও ছিটমহল বিনিময়ের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হয়েছে। এই অর্জন ভারতের সঙ্গে ক্রমাগত বহুমুখী সহযোগিতা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে উৎসাহিত করেছে।
- রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধসহ অন্যান্য বৈশ্বিক সংঘাত ও উত্তেজনার মধ্যেও বাংলাদেশ একটি কার্যকর ও ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে বৃহৎ শক্তিগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে।
- মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা সফলভাবে নিষ্পত্তি করা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। এর মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতির এক অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।
- দশ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দানের মাধ্যমে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেছে। রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনে দ্বিপক্ষীয় ও আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে তাঁর এই সাহসী, মহানুভব, সহানুভূতিশীল ও উদারনীতির জন্য 'মাদার অব হিউম্যানিটি' হিসেবে পরিচিত হন।
- রাশিয়া, চীন এবং আসিয়ান দেশগুলোর সঙ্গে বৈচিত্র্যময় সহযোগিতার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এর দ্বারা শক্তিশালী কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং আঞ্চলিক অংশীদারত্বকে উৎসাহিত করে যাচ্ছে সরকার।
- সার্ক, বিমসটেক, অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ফোরামের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক অব্যাহত রয়েছে।
- ১০টি বৈশ্বিক শান্তিরক্ষা মিশনে সাত হাজারের বেশি শান্তিরক্ষী মোতায়েন করার মাধ্যমে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তায় বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অবদানের বহিঃপ্রকাশ।

- উন্মুক্ত, শান্তিপূর্ণ, সুরক্ষিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সকলের জন্য অভিন্ন সমৃদ্ধিকে উৎসাহিত করতে ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ ইন্দো-প্যাসিফিক রূপরেখা ঘোষণা করে।

আমাদের অঙ্গীকার

- দেশের সার্বিক উন্নয়ন সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য। আর তাই বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, কানাডা এবং অন্যান্য উন্নত দেশের সঙ্গে উন্নয়ন সহযোগিতা চলমান থাকবে।
- আন্তঃসীমান্ত যোগাযোগ, ট্রানজিট, জ্বালানি অংশীদারত্ব এবং ন্যায়সংগত পানিবণ্টনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও নিরাপত্তা সহযোগিতাও অব্যাহত রাখবে সরকার। জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং অভিন্ন নদী অববাহিকার যৌথ ব্যবস্থাপনার জন্য ভারত-ভুটান-নেপালের সঙ্গে সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র উন্মোচন করা হবে।
- বাংলাদেশ উন্নয়ন অর্থায়নের ক্ষেত্রে চীন, রাশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক সম্প্রসারণ করবে।
- দক্ষিণ, মধ্য ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করা হবে।
- বাংলাদেশ তার ভূখণ্ডে জঙ্গি, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর উপস্থিতি রোধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সমগ্র অঞ্চল থেকে এর মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে, সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় দক্ষিণ এশিয়া টাস্কফোর্স গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে আওয়ামী লীগ সরকার।
- বাংলাদেশ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সংহতি, নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় বিশেষভাবে সহযোগিতা করবে। উপরন্তু, আওয়ামী লীগ ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার কাঠামোর মধ্যে আর্থিক লেনদেনকে আরও শক্তিশালী করতে ইচ্ছুক।
- আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াতে নতুন তৎপরতা চালিয়ে যাবে সরকার। এটি সাহায্য করবে বাজার সম্প্রসারণে।
- অস্ট্রেলিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গেও উন্নত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

খ. প্রতিরক্ষা : নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষা

দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় এখন অধিকতর শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল। সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে আধুনিক সমরাস্ত্র, যানবাহন এবং প্রযুক্তির সম্মিলন ঘটানো ছাড়াও সেনাসদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতা রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিরক্ষা সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রণীত 'প্রতিরক্ষা নীতিমালা, ১৯৭৪'-এর আলোকে 'ফোর্সেস গোল-২০৩০' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। সেই নীতিমালার ভিত্তিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সশস্ত্র বাহিনীকে সকল বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখার যে নীতি নিয়েছিল, তা অব্যাহত থাকবে। বাহিনীর সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা সময়ের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাড়ানো হয়েছে। প্রতিরক্ষা বাহিনী এখন আধুনিক, স্মার্ট ও পেশাদার বাহিনী হিসেবে জনগণের আস্থা ও গর্বের প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- ‘ফোর্সেস গোল-২০৩০’-এর আলোকে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে ৩টি কোর গঠন করা হচ্ছে। এছাড়া সিলেট, রামু (কক্সবাজার), বরিশাল, কিশোরগঞ্জের মিঠামইনসহ ৪টি ক্যান্টনমেন্ট প্রতিষ্ঠা, সেনাবাহিনীতে নতুন ৩টি পদাতিক ডিভিশন, পদ্মা সেতু কম্পোজিট ব্রিগেড, আর্মি এভিয়েশন গ্রুপ, প্যারা কমান্ডো ব্রিগেড, আকাশ নিরাপত্তায় ১টি এয়ার ডিফেন্স ব্রিগেডসহ অনেক নতুন ইউনিট/সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়ন ও সমরশক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেনাবাহিনীতে নতুন প্রজন্মের ট্যাংক, ট্যাংক-বিধ্বংসী অস্ত্র, আর্টিলারি গান, আকাশ প্রতিরক্ষা মিসাইল ব্যবস্থাসহ লোকেটিং রাডার, সশস্ত্র ড্রোন, বিমান ও হেলিকপ্টার, রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থা, সাইবার নিরাপত্তা প্রযুক্তি ইত্যাদি সংযোজন করার পাশাপাশি পুরাতন অস্ত্র ও সরঞ্জামাদির আপগ্রেডেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে বৈদেশিক নির্ভরশীলতা দূরীকরণের লক্ষ্যে দেশেই বিভিন্ন অস্ত্র ও গোলাবারুদ উৎপাদন করার পাশাপাশি এর পরিধি বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- পুরুষের পাশাপাশি সকল স্তরে যোগ্যতার ভিত্তিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে এবং প্রতিবছরই তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- সশস্ত্র বাহিনীতে পদোন্নতি, পদসমূহের শ্রেণিবিন্যাস উন্নত করা, বেতন বৃদ্ধি, সদস্যদের শিক্ষা, চিকিৎসা, আবাসন ও অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধাসহ গৃহীত বহুমুখী কল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা হয়েছে।
- প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের অবসরোত্তর ছুটি ছয় মাসের পরিবর্তে এক বছর, ছুটি নগদায়নের অর্থ বারো মাসের পরিবর্তে আঠারো মাসে উন্নীতকরণ, পেনশনযোগ্য চাকরিকাল ১৫ বছরের পরিবর্তে ১০ বছর নির্ধারণ, ক্ষতিপূরণ অনুদান বৃদ্ধিসহ কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারের অবসর ভাতা ৩০ শতাংশের পরিবর্তে ১০০ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্যদের রেশন ভাতা বৃদ্ধি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ সমুন্নত রাখার উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।
- সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ সমুদ্র এলাকায় নিরাপত্তা, নজরদারি, দুর্ঘটনা রোধ, চোরাচালান, জলদস্যুতা ও অন্যান্য নাশকতামূলক অপতৎপরতা রোধে বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক সফল কার্যক্রম গ্রহণ করার মাধ্যমে সমুদ্রসম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- দেশের সমুদ্রসম্পদ রক্ষা এবং দুর্যোগকালে বিভিন্ন এলাকায় দ্রুত সাহায্য পৌঁছানোর জন্য দেশের দক্ষিণাঞ্চলে একটি নৌঘাঁটিসহ পূর্ণাঙ্গ সুবিধাসংবলিত নেভাল এয়ার স্টেশন ‘বানৌজা শের-ই-বাংলা’ এবং সাবমেরিন ঘাঁটি ‘বানৌজা শেখ হাসিনা’ স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- আবহাওয়া অধিদপ্তর অঞ্চলভিত্তিক আবহাওয়ার সর্বশেষ তথ্য জানার জন্য BMD Weather App এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে BMD Aquaculture App প্রবর্তন করেছে। আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের জন্য অটোমেটিক ওয়েদার সিস্টেম, Thunderstorm and Lightning Detection System, Air Quality Monitoring System এবং ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণের জন্য Digital Seismometer স্থাপন করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর ডিজিটাল ম্যাপিং সেন্টার নির্মাণ করেছে এবং ৮ বিভাগে ও ৬৪ জেলায় ডিজিটাল ম্যাপ প্রকাশ করেছে।
- বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) মহাকাশ প্রযুক্তিভিত্তিক বন্যা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বর্তমানে বর্ধিত বন্যাকবলিত এলাকা, ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি, ফসল এবং বন্যাকবলিত জনসংখ্যাসংক্রান্ত তথ্য প্রদান করছে।
- স্পারসো স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন স্থাপন, বাংলাদেশের নিজস্ব দূর অনুধাবন স্যাটেলাইট কক্ষপথে স্থাপন, মহাকাশ শিল্পপার্ক স্থাপনসহ নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

আমাদের অঙ্গীকার

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু প্রণীত ১৯৭৪ সালের প্রতিরক্ষা নীতিমালার আলোকে আওয়ামী লীগ সরকার ফোর্সেস গোল ২০৩০ প্রণয়ন করেছে, এর আলোকে প্রতিরক্ষা বাহিনীর দক্ষতা ও শৃঙ্খলা বৃদ্ধি এবং ব্যবস্থাপনার উন্নতি অব্যাহত থাকবে।
- আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী সশস্ত্র বাহিনীকে দলীয় প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার নীতি অব্যাহত রাখবে।
- প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতির ক্ষেত্রে যোগ্যতা, মেধা, দক্ষতা ও জ্যেষ্ঠতার নীতিমালা অনুসরণ অব্যাহত থাকবে।
- সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার ও সৈনিকদের পেশাগত দক্ষতা এবং তাদের চাকরির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।
- দেশ ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা হবে।
- সশস্ত্র বাহিনীর সকল শ্রেণির সদস্যদের জন্য কল্যাণমুখী নতুন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

বাংলাদেশ শুধু শান্তিরক্ষার কাজ নয়, শান্তি স্থাপনকারী
হিসেবেও সারা বিশ্বে দূত হিসেবে কাজ করতে চায় ।

– জননেত্রী শেখ হাসিনা

৪

বিশ্বনন্দিত রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই সম্ভব হবে অঙ্গীকার বাস্তবায়ন

আওয়ামী লীগ সভাপতি জননেত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দেশকে মর্যাদা ও সম্মানে বিশ্বপরিমণ্ডলে এক অনন্য উচ্চতায় তুলে ধরেছেন। সমসাময়িক রাজনীতিতে তিনি কেবল দলের নয়, দেশের শক্তি ও সম্পদ। সমগ্র বিশ্বে তিনি এক অনন্য কণ্ঠস্বর। তাঁর দৃঢ় মনোবল, সাহসী নেতৃত্ব, ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সবকিছুর উর্ধ্বে উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে দেশে ও বিদেশে জনপ্রিয় করে তুলেছে। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বরাজনীতিতেও তাঁর অনবদ্য ভূমিকা, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর সৃজনশীল অবদান এবং কেবল রাজনৈতিক কূটনীতিতে নয়, অর্থনৈতিক কূটনীতিতেও ঈর্ষণীয় সাফল্য আজ সর্বজনস্বীকৃত। খাদ্যনিরাপত্তা, পরিবেশ রক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, তরুণদের অনুপ্রেরণা, জঙ্গি প্রতিরোধসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন বাঙালি জাতিসত্তার নিপুণ কারিগর, তাঁরই সুযোগ্য কন্যা আওয়ামী লীগ প্রধান জননেত্রী শেখ হাসিনা তেমনি বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় এক অবিসংবাদিত দ্যুতিময় নেত্রী। দেশের সকল মানুষের জন্য তাঁর উন্নয়ন ভাবনা ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা বিশ্বের উন্নয়ন সহযোগীদের অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। উন্নয়নশীল বিশ্বের একজন অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে বিশ্বব্যাপী তাঁর স্বীকৃতির ফলেই দেশবাসীর মনে আজ প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ও বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।

তাঁর দিক-নির্দেশনায় বিগত তিন মেয়াদের নির্বাচনী ইশতেহারের সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় এবারের ইশতেহার **'স্মার্ট বাংলাদেশ'**-এর সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি জননেত্রী শেখ হাসিনার সাহসী প্রত্যয় :

'মুক্ত করো ভয়,
আপনা-মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়।
দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।...
মুক্ত করো ভয়,
দুরূহ কাজে নিজেরই দিয়ো কঠিন পরিচয়॥'

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

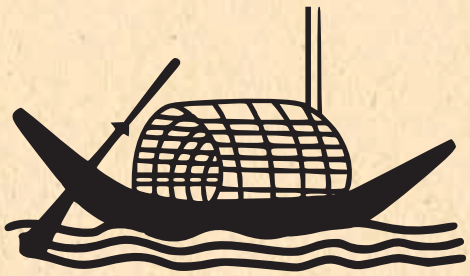

দেশবাসীর প্রতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি

দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার আহ্বান

প্রিয় দেশবাসী,

আপনাদের জানাই ইংরেজি নববর্ষের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

আগামী ৭ই জানুয়ারি ২০২৪ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচন সামনে রেখে প্রথমেই আমি ১৯৭৫ সালের পনেরোই আগস্টে নিহত আমার বাবা স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মা-ভাইসহ সকলকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। মহান মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ লক্ষ শহিদের প্রতিও রইলো গভীর শ্রদ্ধা।

দেশ যখন আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে অব্যাহতভাবে গণতান্ত্রিক-সাংবিধানিক ও উন্নয়ন-অগ্রগতির পথে অগ্রসর হচ্ছে, তখন জাতির জন্য সাংবিধানিক ধারায় এই নির্বাচন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সুষ্ঠু-অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা আজ সময়ের দাবি। ভোট হচ্ছে আপনাদের পবিত্র আমানত, অধিকার। আওয়ামী লীগ জন্মলগ্ন থেকেই বিশ্বাস করে যে, আপনারাই সকল ক্ষমতার উৎস। তাই নির্বাচন সামনে রেখে আপনাদের প্রতি আমার আকুল আবেদন, আপনারা মহামূল্যবান ভোট প্রদান করে মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে অর্জিত জাতির বহু আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যাভিমুখী পথকে বাধাবিঘ্ন মুক্ত করুন।

প্রিয় দেশবাসী,

বাংলাদেশ এখন এক অভূতপূর্ব উন্নয়নের বিস্ময়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্যে এক উজ্জ্বল রোল মডেল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার মানসে আমাদের অব্যাহত অগ্রযাত্রায় সাফল্যের পনেরো বছর সগৌরবে পূর্ণ হতে চলেছে। জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার অক্লান্ত পরিশ্রম করে মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটিয়েছে। খেত-খামার, কল-কারখানা, গ্রাম-শহর, নগর-বন্দর সর্বত্রই দৃশ্যমান উন্নয়নের ছোঁয়া। কৃষির বিস্ময়কর রূপান্তর ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে সকল মানুষের খাদ্যনিরাপত্তা আমরা নিশ্চিত করতে পেরেছি, দেশ থেকে ক্ষুধা-দারিদ্র্য দূর করতে পেরেছি। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামোসহ প্রতিটি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থান বাড়িয়েছি। এর ফলে আমাদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে এখন ২ হাজার ৭৬৫ ডলারে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বদরবারে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এখন আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সমর্থ হয়েছি।

২০০৮ সালের 'দিন বদলের সনদ', ২০১৪ সালের 'শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে' এবং ২০১৮ সালের 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' বিনির্মাণে আমরা আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়ন করে চলেছি। বিশেষ করে, তৃতীয় মেয়াদে সর্বগ্রাসী করোনা, রাশিয়া-ইউক্রেন ও ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন যুদ্ধ এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও আমরা

অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছি, সফলভাবে দ্রুততম সময়ে করোনা অতিমারি প্রতিরোধ করেছি এবং খাদ্য-বাসস্থানসহ মানুষের জীবনমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে পেরেছি।

জনগণের অবিচল আস্থাই আওয়ামী লীগের শক্তি। এদেশের জনগণের প্রতি আমাদের রয়েছে অগাধ বিশ্বাস। তাই আমরা নিজেদের অর্থায়নে স্বপ্নের পদ্মা সেতুর মতো বিশাল অবকাঠামো গড়ে তোলার সাহস দেখাতে পেরেছি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মেট্রোরেল, বর্ধিত বিমান ও নৌবন্দর, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা বন্দর, কর্ণফুলী টানেল, গভীর সমুদ্রবন্দরসহ প্রতিশ্রুত মেগা প্রকল্পগুলো। এসব অত্যাধুনিক অবকাঠামোগুলোর বাস্তবায়ন উন্নয়নের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে। ইতোমধ্যে আমরা বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছর ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে আমাদের উন্নয়ন ও সাফল্য বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরে প্রশংসা লাভ করেছি। আপনারা সকলে এ কৃতিত্বের গর্বিত অংশীদার। এ জন্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছি। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে গ্রাম পর্যায়ে ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন ও অনলাইন সংযোগের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছি। আমাদের লক্ষ্য এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে উন্নত প্রযুক্তিসমৃদ্ধ টেকসই সমাজ গড়ে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণ করা। স্মার্ট বাংলাদেশের মূলস্তম্ভ হবে স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ও স্মার্ট অর্থনীতি। এই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রধান শক্তি হবে বিশাল তরুণসমাজ—জাতির কাছে এটা আমাদের প্রতিশ্রুতি।

আওয়ামী লীগ নারী ও তারুণ্যের বিকাশ এবং তাদের অমিত শক্তিকে পুরোপুরি উৎপাদনশীল কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর। আমরা গর্ব করে বলতে চাই যে, সমগ্র দেশে ভৌত অবকাঠামো, নিবিড় যোগাযোগ নেটওয়ার্ক, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সঞ্চালন সম্প্রসারিত হয়েছে। সেই সঙ্গে ইতোমধ্যেই কর্মসংস্থানমুখী শতাধিক অর্থনৈতিক অঞ্চল, ইপিজেড ও হাই-টেক পার্ক নির্মিত হওয়ার ফলে বহু দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হচ্ছে। এটা খুব উৎসাহব্যঞ্জক যে আমরা এসব যুগান্তকারী অবকাঠামো ও শিল্পায়নের প্রাথমিক পর্যায়েই আশানুরূপ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পেরেছি। আগামীতে এসব উদ্যোগ পূর্ণ উদ্যমে চালু হবার পর আরও বহুমাত্রিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। বিদেশি ভাষা শিক্ষাসহ যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত করে তরুণদের জন্যে আমরা বিদেশেও নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ বের করছি। অমিত সম্ভাবনার তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প বিকাশের সহায়ক পরিবেশ ও অবকাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে তরুণদের নানামুখী আয়ের পথ সৃজন করা হচ্ছে।

সমাজের সকল পর্যায়ে নারীর কার্যকর প্রতিনিধিত্ব ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্যে আমরা সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবে সমর্থন ও সহায়তা অব্যাহত রাখব। দেশের সকল নাগরিককে অবসর ভাতার আওতায় আনতে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছি, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম উদাহরণ। এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগের ফলে ৬০ বছরের বেশি বয়স্ক নাগরিকগণ আর্থিকভাবে নিরাপদ বোধ করবেন এবং তাঁদেরকে ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কে থাকতে হবে না। টানা পনেরো বছরের দেশ পরিচালনার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেশের অমিত সম্ভাবনা ও সুযোগ সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছি। আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ শক্তি কাজে লাগিয়ে আগামী দিনেও উন্নয়নের জয়যাত্রা অব্যাহত রাখতে চাই।

আমরা ইতোমধ্যেই স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছি এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রধান শক্তি। একটি অসাম্প্রদায়িক সুখী, সুন্দর

বাংলাদেশ গড়তে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আওয়ামী লীগ সরকার ও জনগণের মধ্যে রয়েছে এক চমৎকার মেলবন্ধন, যার ওপর ভিত্তি করে আমরা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের বিরুদ্ধে সকল দেশি-বিদেশি চক্রান্ত নস্যাৎ করে এগিয়ে যাব। সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করাই আওয়ামী লীগের নীতি ও আদর্শ।

প্রিয় দেশবাসী,

এটা এখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে জনগণ দৃশ্যমান উন্নয়ন পায়। আমরা শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, জনগণের কল্যাণে অব্যাহতভাবে কাজে বিশ্বাসী। আমাদের এবারের অঙ্গীকার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ। এ লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। আমাদের প্রতিশ্রুত 'আমার গ্রাম—আমার শহর' অনুযায়ী প্রতিটি গ্রামে শহরের আধুনিক সুবিধাদি আরও ব্যাপকভাবে পৌঁছে যাবে। কৃষি যান্ত্রিকায়নের ফলে শ্রমের কষ্ট লাঘব হবে, কৃষকের খরচ কমবে, উৎপাদন ও লাভ বাড়বে। কৃষিকে আমরা একটি লাভজনক ও সম্মানের পেশা হিসেবে গড়ে তুলব। আমরা বিভিন্ন পেশাজীবী ও খেটে খাওয়া মানুষের কল্যাণে বিনিয়োগ বাড়াব।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, অগ্নিসন্ত্রাস, অবরোধ ও বিশৃঙ্খলার রাজনীতি শুধু ধ্বংসই ডেকে আনে, উন্নয়নের গতিকে বাধাগ্রস্ত করে। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করেছি যে, সাম্প্রতিক সময়ে কীভাবে উপর্যুপরি গণতন্ত্রবিরোধী শক্তি জানমালের ক্ষয়ক্ষতি এবং জনমনে ত্রাস সৃষ্টি করে স্বাভাবিক জীবনযাপন ও উন্নয়নকে বিঘ্নিত করেছে। আমরা এসবের অবসান চাই, চাই গণতান্ত্রিক পরিবেশে সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন। আমরা মাদক, দুর্নীতি ও অবিচার নির্মূল করে সমাজের সকল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করব।

এবারও চারদিকে আওয়ামী লীগের নৌকার পক্ষে গণজোয়ার উঠেছে। এ দেশের মানুষের স্বাধীনতা, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা, ডিজিটাল, পরমাণু ও স্যাটেলাইট যুগে প্রবেশ—সবই সম্ভব হয়েছে নৌকায় ভোট দিয়ে। আমাদের আহ্বান, সব ভেদাভেদ ভুলে সম্মিলিতভাবে দেশ ও জনগণের স্বার্থে আপনারা হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নৌকা, বঙ্গবন্ধুর নৌকা, আওয়ামী লীগের নৌকার পক্ষে রায় দিন, বিগত পনেরো বছরের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখুন। এটা প্রমাণিত যে অব্যাহত উন্নয়নের জন্যে সরকারের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখা দরকার।

প্রিয় দেশবাসী,

পঁচাত্তরের সেই কালরাতে মা-বাবা-ভাইদের হারিয়ে সুদীর্ঘ ৪৮ বছর ধরে দুঃসহ জীবন পার করছি। আমরা দুই বোন বিদেশে ছিলাম বলে প্রাণে বেঁচে গেছি। পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে বাধ্য হয়ে বিদেশে থেকেও দেশের জন্য কাজ করেছি, আর কী করলে দেশের মানুষ ভোট ও ভাতের অধিকার ফিরে পেতে পারে, তা নিয়ে ভেবেছি। আওয়ামী লীগ ১৯৮১ সালে আমাকে সভাপতি নির্বাচন করে। হত্যা-ক্যু-পাল্টা ক্যুর সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ভয়াবহ দিনগুলোতে শিশুপুত্র-কন্যাসহ পরিবারকে স্নেহবঞ্চিত করে বিদেশে রেখে জীবনের মায়া ত্যাগ করে আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে বাংলা মায়ের কোলে আমি ফিরে আসি। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিনে ঝড়-বৃষ্টিস্নাত সেই বিকেলে আপনাদের বলেছিলাম :

'আমি আওয়ামী লীগের নেত্রী হওয়ার জন্য আসিনি। আপনাদের বোন হিসেবে, মেয়ে হিসেবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কর্মী হিসেবে আমি আপনাদের পাশে থাকতে চাই।...আমার হারাবার কিছু নাই। পিতা-মাতা, ভাই—সবাইকে হারিয়ে আমি আপনাদের কাছে এসেছি। আমি আপনাদের মাঝেই তাদের ফিরে পেতে চাই।'

সেই দিনের কথাই আমার অন্তরের কথা, আজকেরও কথা। ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলাসহ ১৯ বার আমাকে হত্যার জন্য জাতির শত্রুরা হামলা চালায়। আমার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কখনো জীবনের মায়া করেন নাই, আমিও করি না। আপনাদের সঙ্গে আছি ও থাকব। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আপনারাও আমার সঙ্গে থাকবেন।

আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণ করা। আপনাদের সমর্থন পেয়ে তা সফল করতে সমর্থ হয়েছি। আমি আশা করবো, আবারও আপনাদের সমর্থন নিয়ে দেশ ও মানুষের সেবা করার সুযোগ পাবো।

প্রিয় ভোটার ভাই ও বোনেরা,

আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার নির্বাচন, অনুন্নয়ন ও পশ্চাৎপদতার বিপরীতে ধারাবাহিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির নির্বাচন। আমাদের নিরলস পরিশ্রম ও উন্নয়ন অর্জনগুলো সঠিক মূল্যায়ন করে দেশ ও জাতির অব্যাহত কল্যাণ, শান্তি-সংহতি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৮ সাল পর্যন্ত আগামী পাঁচ বছরের জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষে আপনাদের মহান রায় প্রার্থনা করছি। লাখো লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নলালিত সোনার বাংলা বিনির্মাণের অভিযাত্রায় আবারো নৌকার পক্ষে সমর্থন চাই, আপনাদের মূল্যবান ভোট চাই। সরকার পরিচালনার বিশাল কর্মযজ্ঞে আমাদের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া স্বাভাবিক। আপনাদের রায় নিয়ে তা সংশোধন করে জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চাই। আমাদের প্রার্থনা, আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের জয়যুক্ত করে আমাদেরকে আবার জনগণের সেবা করার সুযোগ দিন। নৌকা মার্কায় ভোট দিন।

সবশেষে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কণ্ঠে বলি,

"মেঘ দেখে কেউ করিস নে ভয়
আড়ালে তার সূর্য হাসে,
হারা শশীর হারা হাসি
অন্ধকারেই ফিরে আসে।"

আপনাদের আবারও জানাই প্রাণভরা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

www.albd.org

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

+8802223367880, +8802223367882

office@albd.org | alparty1949@gmail.com